KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007/	Place of Publication : 82 বিধান পল্লী, যাদবপুর, কল-৩২ (21) সি/2 আর-২২৬-ই ৬০/২ রামকৃষ্ণ সমাধি রোড, কল-৫৪
Collection : KLMLGK	Publisher : অরবিন্দ বসু
Title : অন্তরতম	Size : 8.5"/5.5"
Vol. & Number : 18 19 20 21	Year of Publication : Sep 1983 May 1985 May 1986 Feb 1989 Condition : Brittle / Good ✓
Editor : অরবিন্দ বসু	Remarks :

C.D. Roll No. : KLMLGK

আক্তা ভনাস

With best compliments of :

VOTA

Diesel & Electrical Pump Sets.

Dealer

AGRO • DEVELOPMENT CONSULTANT

BOWBAZAR ● KRISHNAGAR ● NADIA

অজ্ঞাতবাস অজ্ঞাতবাস অজ্ঞাতবাস অজ্ঞাতবাস অজ্ঞাতবাস অজ্ঞা-
প্রথাবিরুদ্ধ কবিতা ও কবিতা বিষয়ক গদ্য-পদ্যের কাগজ প্রথাবিরুদ্ধ
কবিতা ও কবিতা প্রথাবিরুদ্ধ কবিতা ও কবিতা বিষয়ক গদ্য-পদ্যের
অজ্ঞাতবাস সংকলন: ১৯, মে, ১৯৮৫ অজ্ঞাতবাস সংকলন ১৯, মে '৮৫

সূচি অজ্ঞাতবাস সংকলন ১৯, মে, ১৯৮৫

কবিতা: ঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মা পুনর্মুদ্রণ দ্বৈপায়ন আচার্য অরিন্দম রায়
দেবাশিস তরফদার সঞ্জীব প্রামাণিক ভাষা শব্দ ও আঙ্গিক প্রসঙ্গে:
দেবদাস আচার্য কবিতা: অনুরাধা মহাপাত্র নীলকান্ত রায় প্রসূন
বন্দ্যোপাধ্যায় কমল চক্রবর্তী সমীরণ রায় চন্দন মুখোপাধ্যায়
সাম্প্রতিক বাংলা কবিতা পাঠের অভিজ্ঞতা: পার্থপ্রতিম কাঞ্জিলাল
কবিতা: নির্মল হালদার সন্তোষ রায় প্রফুল্ল দাস সুতপা সেনগুপ্ত
শমিত মণ্ডল অলোকনাথ মুখোপাধ্যায় তরুণ দাশ মুকুল চট্টোপাধ্যায়
অসিত সিংহ অরণি বসু কবিতা বিষয়ক গদ্য-'৭০: অরুণকুমার ঘোষ
কবিতা: কালীকৃষ্ণ গুহ বপ্পন সরকার পার্থপ্রতিম কাঞ্জিলাল
বীরেন্দ্রনাথ রক্ষিত নিত্য মালাকার স্নেহাশিস শুকুল দেবারতি মিত্র
তাপসরায় মানসরঞ্জন ভট্টাচার্য অরুণ সাধুখাঁ সুজিত সরকার সঞ্জয়
চক্রবর্তী অরুণ বসু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পুনর্মুদ্রণ প্রচ্ছদ: রতন
বন্দ্যোপাধ্যায় প্রচ্ছদ মুদ্রণে: নিউ কল্পনা প্রেস কলকাতা-৭২
অজ্ঞাতবাসের পক্ষে প্রকাশক অরুণ বসু ৪২ বিধান পল্লী যাদবপুর
কলকাতা-৭০০০৪২ থেকে প্রকাশিত এবং অমি প্রেস ৪৯ পটল-
ডাঙ্গা স্ট্রীট কলকাতা-৭০০০০৯ থেকে মুদ্রিত দাম: চার টাকা

যা আপনাকে জেগে উঠতে সাহায্য করবে

সুহাসিনীর পমেটম কমলকুমার মজুমদার
ফিরে এসো চাকা বিনয় মজুমদার
অন্নপূর্ণা ও শুভকাল গৌতম বসু
শব ও সন্ন্যাসী অরুণেশ ঘোষ
অন্ধকারের নৌকো সুতপা সেনগুপ্ত
জিপ্‌সীদের তাঁবু রণজিৎ দাশ
রন্ধনশালা বাসুদেব দাশগুপ্ত
মাতা ও মৃত্তিকা অমিতাভ গুপ্ত
ছোরার্ বদলে একদিন সেলিম মুস্তাফা
নরকের মেঘ অনির্বাণ লাহিড়ী
প্রতিভূমিকা সমীরণ ঘোষ
পৌত্তলিক গৌতম চৌধুরী
আমার চাবি সুভাষ ঘোষ
ছাই-ফুল স্তূপ অনুরাধা মহাপাত্র
আপেলের বিকল্প দেবাশিস তরফদার

ঠুঁটো জগন্নাথ দেবদাস আচার্য
আলিবাবা নীলোৎপল মজুমদার
প্রতিবাদী সাহিত্য শৈলেশ্বর ঘোষ
সীতা নির্মল হালদার
হস্টেল থেকে লেখা কবিতা কালীকৃষ্ণ গুহ
অষ্টবসুর বিভা অশোক দত্ত
আবার পুরী সিরিজ উৎপলকুমার বসু
ঋক্ষ মেষ কথা সুবোধ সরকার
আলেয়া হ্রদ জয় গোস্বামী
রাত্রি চতুর্দশী পার্থপ্রতিম কাঞ্জিলাল
চল্লিশ চাঁদের আয়ু মল্লিকা সেনগুপ্ত
অলীক কুকাব্য রঙ্গে তুষার চৌধুরী
অবিদ্যা সংযুক্তা বন্দ্যোপাধ্যায়
ছড়া সমগ্র অন্নদাশঙ্কর রায়

প্রসঙ্গ, অজ্ঞাতবাস ১৯

অজ্ঞাতবাস ১৮ বেরিয়েছিলো '৮৩-র সেপ্টেম্বরে। ইতিমধ্যে ১৯ মাস অতিক্রান্ত। পরবর্তী সংখ্যা ফেব্রুয়ারি '৮৪-তে প্রকাশের কথা আমরা ঘোষণা করেছিলাম। আর্থিক কারণেই সম্ভব হ'য়ে ওঠেনি। এ-জন্য আমরা আন্তরিকভাবে দুঃখিত।

দ্বিতীয়তঃ, এই সংখ্যার সমস্ত লেখাই প্রায় একবছর আগের। পুরোনো। একবছরে শিল্প সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সূক্ষ্ম মোচড় অবশ্যই তৈরী হতে পারে। সেই হিসেবে এই প্রকাশ অতি-জীর্ণ—এরকম মনে হওয়াই স্বাভাবিক। ফলে, বর্তমান সংখ্যা আংশিক বাতিল ব'লে গণ্য করছি। এবং খুবই সঙ্গতকারণে শ্রীঅরুণকুমার ঘোষ তাঁর গদ্যটিকে প্রত্যাহার ক'রে নিয়ে চিঠি দিয়েছেন। আমি অরুণবাবুর সঙ্গে একমত। একমত, যেহেতু, অজ্ঞাতবাসে ওঁর লেখাটি (এক বছর আগের) ছাপতে দেওয়ার পরে রণজিত দাশের 'জিপসীদের তাঁবু' এবং নির্মল হালদারের 'সীতা' প্রকাশিত হয়েছে, এবং গুণগত উত্তরণে এই দুই বিপরীতমুখী কবি নিজেদের কবিতা বিষয়ে আরো নতুন কিছু সংযোজন দাবী করছেন। ফলে, রচনাটি অসম্পূর্ণ এবং খণ্ডিত হ'য়ে পড়েছে, অস্বীকার করা যায় না।

একইভাবে, পার্থপ্রতিম কাঞ্জিলালের 'সাম্প্রতিক বাংলা কবিতা পাঠের অভিজ্ঞতা' শীর্ষক আলোচনাটিও আর ঠিক সাম্প্রতিক নয়। বলা বাহুল্য, এই গদ্যটিকেও আমরা প্রত্যাহার ক'রে নিচ্ছি। একমাত্র দেবদাস আচার্যর ভাষা, আঙ্গিক ও শব্দ বিষয়ক রচনাটি সমস্ত রকম সাম্প্রতিকতার ঊর্ধে। (তা নাহলে, এ-সংখ্যা অজ্ঞাতবাসকে পুরোনো কাগজের সঙ্গে কে, জি, দরে বেচে ফেলতে হ'তো।)

উজ্জ্বল, বুদ্ধিদীপ্ত কিন্তু পাণ্ডিত্যহীন এবং ঈশ্বরের চেয়েও ধারালো এই মূল্যবান গদ্য রচনাটি সমৃদ্ধ করেছে অজ্ঞাতবাসকে। ঋণী করেছে আমাদের—পাঠকদের। অপরিশোধ্য এই ঋণ। এ-প্রসঙ্গে বলাই বেশি, লেখাটি, নিঃসন্দেহে, পূর্ণাঙ্গ রচনা নয়। এমন কি ভিন্নমত পোষণের জায়গাও হয়তো প্রচুর র'য়ে গেছে। সে কারণে, অভিজ্ঞ ও কৃদ্ধ ও সচেতন পাঠকদের প্রতি সবিনয়ে জানাচ্ছি, তাঁরা তাঁদের সুস্থ, যুক্তিগ্রাহ্য, সুস্থির মতামত অবশ্যই লিখে জানাতে পারেন। কোনরকম কূটতর্ক নয়, আমরা এ-বিষয়ে নরম ও রুচিনম্র বিতর্ক চাই। আমরা এই বিষয়টিকে আরো গভীর ও সমৃদ্ধ করতে চাই।

এই মুহূর্তে উক্ত রচনার একটি তথ্যগত অসঙ্গতির কথাও বলা প্রয়োজন ব'লে মনে করছি। কবি দিনেশ দাস তাঁর শ্রেষ্ঠ কবিতার ভূমিকায় লিখেছেন, '... 'কাস্তে' ছাপার হরফে মুক্তি পায় (১৯৩৮)। কবিতাটি প্রকাশের পরের বছর বুদ্ধদেব বসুর শারদীয় "কবিতা" পত্রিকায় সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ও বিষ্ণু দে কবিতাটির 'এযুগের চাঁদ হ'ল কাস্তে' ছত্রটি শিরোনাম দিয়ে দুটি সার্থক কবিতা রচনা করেন।' কিন্তু' অজ্ঞাতবাসের সাতচল্লিশ পৃষ্ঠায় দেবদাস আচার্য সুধীন্দ্রনাথ দত্ত প্রসঙ্গে এক জায়গায় লিখেছেন, "এযুগের চাঁদ কাস্তে'—একথা উনিই প্রথম বলতে পেরেছেন—যুগ ধর্মের দিকে প্রাজ্ঞ নজর রেখেই।' আমরা এই তথ্যগত অকস্মাৎ-ভুলকে স্বীকার ক'রে সংশোধন ক'রে নিলাম। এবং ছাপা হ'য়ে যাওয়ার আগেই আমাদের (দেবদাস ও আমার) দুজনেরই চোখে পড়া উচিত ছিলো, অবশ্যই। এ-জন্য আমরা দুঃখিত ও ক্ষমাপ্রার্থী।

আপনাদের নিশ্চয়ই স্মরণে আছে, প্রতিবছর একজন কবিকে পত্রিকার পক্ষ থেকে 'অজ্ঞাতবাস পুরস্কার' দেওয়ার কথা আমরা গত সংখ্যায় বলেছিলাম। আমাদের ব্যক্তিগত বন্ধু, কবি ও শুভানুধ্যায়ী যাঁরা, তাঁরা প্রায় প্রত্যেকেই এ-ব্যাপারে আপত্তি জানিয়েছেন। আমরা এ-আপত্তি মাথা পেতে নিয়েছি। আমাদের ওই প্রাক্তন সিদ্ধান্ত খুবই হঠকারী ছিলো, বুঝতে পারছি। তা সত্ত্বেও, আমি মনে করি, ছোট কাগজের দুরন্ত লেখকদের সম্মানিত করার প্রয়োজন আছে—সুস্থসংস্কৃতির স্বার্থে। কিন্তু, কোন্ পদ্ধতিতে, তা আমি জানি না। জানার ইচ্ছেও নেই।

তবে কবিতা চর্চা যে এখন মূলতঃ কলকাতার বাইরে চ'লে যাচ্ছে—এ-বিষয়ে আমি নিজে নিঃসন্দেহ। জেলা ও মহকুমা শহরে ক্রমশঃ তার বিকিরণ ছড়িয়ে পড়ছে, আমি দেখতে পাচ্ছি। পুরুলিয়া ও নদীয়ায় তৈরি হচ্ছে ভবিষ্যৎ কবিতার নতুন নির্মিতি। এছাড়া, কুচবিহার, জলপাইগুড়ি সহ গোটা উত্তরবঙ্গের তরুণ প্রজন্ম এখন নিছকবদ্‌রাগীপদ্যের অনুশাসন ভেঙে বেরিয়ে এসে, নদীর পারে, খোলা আকাশের নিচে প্রার্থনা করছে কবিতার জন্য মুক্তবাতাসের। অজ্ঞাতবাস সবিনয়ে সেই সুবাতাসকেই পৌঁছে দিতে চায় সকলের কাছে—সর্বত্র।

সুতরাং, এরপরেও অজ্ঞাতবাস বেরোবে, আশা করতে পারেন। নিশ্চয়ই বেরোবে। যথারীতি এবং অনিয়মিত।

অরুণ বসু

বর্ণপরিচয় প্রথম ভাগ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রণীত
বিসিভাবের সংস্করণ হইতে পুনর্মুদ্রিত।

ঈশ্বরচন্দ্র শর্মা

১৩ পাঠ

তারক ভালো পড়িতে পারে।
ঈশান কিছুই পড়িতে পারে না।
কৈলাস কাল পড়া বলিতে পারে নাই।
আজ অসুখ হইয়াছে, পড়িতে যাইব না।
কাল জল হইয়াছিল, পথে কাদা হইয়াছে।
তুমি দৌড়িয়া যাও কেন, পড়িয়া যাইবে।
উমেশ ছুরিতে হাত কাটিয়া ফেলিয়াছে।

বর্তমান বাংলা কবিতার অনন্য ব্যক্তিত্ব দেবদাস আচার্যর প্রথম পুত্র, পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্র দ্বৈপায়ন। ওর মতো অসাধারণ বুদ্ধিদীপ্ত ছেলে সচরাচর চোখে পড়ে না। খুব গোপনে, মা-বাবাকে লুকিয়ে ও কিছু পদ্য লিখে ফেলেছিলো। ধরা পড়ে যাবার পর, আমরা মিষ্টি-লয়ের এই কবিতাটি ছেপে দিয়ে আসলে নিজেদেরই অলঙ্কৃত করলাম।

দ্বৈপায়ন আচার্য

পেশা

হরিরাম ঘোষ
পোষে গরু মোষ,
দুধে জল দিয়ে বলে—
আমার কী দোষ!

ক্ষুদিরাম পাল
বেচে চাল ডাল,
চালেতে কাঁকর ভরা—
ডালেতে ভেজাল।

নরহরি হালদার,
আম খায় মালদার,
ডালডায় চর্বি দিয়ে
পাঠাবে সে ঝালদায়।

মনোহর দত্ত,
ব্যবসাতে মত্ত,
আলু বেচে খুব বাজে,
পচা আমস্বত্ত্ব।

মুখে-মুখে ছড়া বানায়। আমরা এই বিরলদৃষ্ট, সপ্রতিভ বালকটির একটি ছড়া ছেপে, ওকে আমাদের উষ্ণ-উল্লাস জানাচ্ছি। থ্রি চিয়ার্স ফর অরিন্দম।

অরিন্দম রায়

কু ঝিকঝিক

কু ঝিকঝিক কু ঝিকঝিক
চল না ট্রেন তাড়াতাড়ি,
ট্রেন থেকে নামলে পরে
দেখবি তবে মারামারি।
মারামারির শব্দ শুনে
দেখবি তবে কান্নাকাটি,
কত বলছি শুনছ নাতো
মারবে যখন মাথায় লাঠি।

দেবাশিস তরফদার

গল্প

পুরোনো গল্পগুলি। তেলচিটে কোনো এক ঠাকুমাঝুলির।

ঘটনা উঠুক ঝলসে, এই তো চাও। পাশের বাড়ির জন্মদিনে
পর্দাগুলি দুলে উঠলে অনেক পিছল আলো, গান আর টফি
ছিটকে আসে। ঘটনা কি সেরকম কিছু ?

কোন গল্পে খুশী হবে বলো ?

উষ্ণ তাঁবু। গোল হয়ে শুনছে লোক। যাত্রাপথের কথা।
জ্ঞানবৃক্ষের কথা। সে রকম ?

অসম্ভব। কালকের গল্পই আরো একটু ভালো করে বলবো ভাবি।

সঞ্জীব প্রামাণিক

তুমিও ঘাতক

কথা ছিল বলে তাই আসা। রাজমহলের এই অনামী পাহাড়ে।
সূর্য বসেছে পাটে। যেন হাজার হাজার ডিমের কুসুম ভেঙ্গে রেখে গেছে কেউ
আকাশের বুকে। যেন বিধবার রক্তের শেষ গর্জন এসে এখানে থেমেছে। কথা ছিলো
একাই কাটাবো দিন দু-হাঁটুতে মুখ গুঁজে। সেলুনের পাশে জমে থাকা
কালাভ চুলের মতো সন্ধ্যা নামে। তবু মনে পড়ে ওই যে সৌর-আবির—
ওই যে কুসুম, বিধবার রক্তের শোক ; একে ভোলা যাবে না কখনো।

বাইশে জুলাই আজ। মাঝরাতে ঘুম ভাঙ্গে। মনে পড়ে রাতের পোশাক।
বউ দেশে। আমি একা দেশলাই খাপের মতো হোটেলের ছোট ঘরে আশ্রয় নিয়েছি।
পাহাড় বোঝে নি কিছু, বউও জানে না ; মরে গিয়ে কাল ভোরে আমিই উঠবো
ফুটে ভোরের আকাশে।

অজ্ঞাতবাস

ব্যক্তিগত কৌতূহলবশতঃ

দেবদাস আচার্য

১.

'আমার মনে হয়, আমাদের যুগ আজও নতুন বিষয়বস্তুর উপযোগী আঙ্গিক খুঁজে পায়নি। মাঝে মাঝে আঙ্গিকের সন্ধানকে আঙ্গিক-সর্বস্বতা (formalism) বলে অবিহিত করা হয়। আমার ধারণা, আঙ্গিক-সর্বস্ব লোক বলতে বোঝায় এমন লোক যার মানসিক ঐশ্বর্য নেই, এমন লোক যে কথা বলতে জানে অথচ যার কোনো বক্তব্য নেই। সে লোক সুকৌশলে পুরোনো আঙ্গিকের ব্যবহার করতে পারে ও উদ্ভট নতুন আঙ্গিকও উদ্ভাবন করতে পারে—কিন্তু তা সত্ত্বেও তাকে আঙ্গিক-সর্বস্ব লোক বলব। সংক্ষেপে, আঙ্গিক-সর্বস্বতার অর্থ আঙ্গিক সম্বন্ধে আগ্রহ নয়, আঙ্গিক-সর্বস্বতার অর্থ বিষয়বস্তুর অনুপস্থিতি।'—ইলিয়া এরেনবুর্গ ॥ লেখক ও জীবন ॥ শিল্পীর আয়ুধ ঃ সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা ॥ সম্পাদনা ঃ ডঃ অরবিন্দ পোদ্দার ॥ পৃঃ ৯০

Aristotle তাঁর Poetics-এ বলেছেন 'beauty is bound up with size and order'।

প্রথম উদ্ধৃতিটি সাম্প্রতিককালের এক বিখ্যাত লেখিকার, দ্বিতীয়টি চিরকালের Aristotle-এর। প্রথমটির সঙ্গে দ্বিতীয়টির সময়ের ব্যবধান দু'হাজার বছরের বেশি। প্রথম উদ্ধৃতিটি আমাদের সমকালের, দ্বিতীয়টি সুপ্রাচীনকালের এক দার্শনিকের। কিন্তু 'beauty is bound up with size and order'—ফর্ম বা আঙ্গিক সম্বন্ধে এই চিরজীবী মন্তব্যটি চিরদিনের সত্য। তবে উনি একটি 'beauty' বা 'সুন্দর' শব্দ ব্যবহার করেছেন। সুন্দর সম্বন্ধে তাঁর ধ্যান-ধারণা আজকাল উদ্ভট বা আজগুবি বলে মনে হবে। এবং তাঁর Poetics নির্দেশিত নন্দনতত্ত্বের অনেক কিছুই দীর্ঘকাল ধরে মানার কোনো প্রয়োজন হয়নি। প্লেটো মনে করতেন একটা বল এবং একটা র‍্যাকেটের মধ্যে বলটাই Perfect এবং Perfect বলে তা র‍্যাকেটের চেয়ে সুন্দর। Perfect মানে বলটা যে দিকেই ঘোরানো যাকনা কেন, সমান Space নেবে। আর র‍্যাকেটা সে ক্ষেত্রে বড়ই এলোমেলো। এই যে সমান Space নেওয়া—এটাই Shape-এর beauty। এই গোলাকার—যা সমান space নেয় তা কেন সুন্দর ? কেননা, তা সৃষ্টির সবচেয়ে সেরা 'নকল'। উনি শিল্প মানে 'নকল' ভাবতেন—সৃষ্টির 'নকল'। এবং ওঁর ধারণা ছিল পৃথিবী নিখুঁত গোলাকার। স্থির। পৃথিবীর ওপরে একটা অর্দ্ধ গোলাকৃতি 'Dome' বা গম্বুজ —নীচে অর্দ্ধগোলাকৃতি বা গম্বুজ—এই দুই নীল অর্দ্ধগোলাকার গম্বুজ মিলে একটা পূর্ণ গোলাকার নীল রং এর গম্বুজ তৈরী হয়েছে। এই নীল গোলাকার গম্বুজে ঘেরা থাকে পৃথিবী। এই গোলাকার আকাশ-রূপ গম্বুজ স্বচ্ছ। এর ৩২/৩৩টা ফুটো আছে। ঐ ফুটোর মধ্যে দিয়ে সূর্য, চন্দ্র ও কিছু কিছু নক্ষত্র পৃথিবীকে

নয়

প্রদক্ষিণ করে। আর অসংখ্য তারকারা আসলে রাতে ঐ নীল গোলাকার আকাশকে রত্নখচিত করে।—ইত্যাদি ইত্যাদি। তাই, নকল হিসেবে 'বল' 'Perfect' এবং 'Perfect' বলেই র‍্যাকেটের অনুপাতে অনেক বেশি সুন্দর হওয়াই স্বাভাবিক। এবং একারণেই Arstotle গ্রীক ট্রাজেডিকে, ট্রাজেডির ঘটনার আবর্তকে সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্তের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকার নির্দেশ দিয়েছিলেন। এসব আমরা জানি। উনি আরো বলেছিলেন—'Poetry is concerned with universal truth'—এবং সে ক্ষেত্রে উনি যুক্তি দেখিয়েছিলেন 'সার্থক নকল নিজেই একরকম সৌন্দর্য গড়ে তোলে'—। ভাগ্যিস 'নেমেসিস'-নামক এক অসহায়তাকেও তিনি গ্রাহ্য করেছিলেন। না হলে গ্রীক-ট্রাজেডির কি দুর্দশাই না হত। এখানে, খুব সংক্ষেপে তার universe এর idea, এবং ঐ আইডিয়াকে অবলম্বন করে universal truth-এর আবিষ্কার—এবং ঐ 'truth'-কে নকল—সফল নকল করার মধ্যে সকল সৌন্দর্য চেতনার স্বীকৃতির একটা খুব সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া গেল। এখন আমরা আজকের এক সাহিত্যকর্মী—ইলিয়া এরেনবুর্গ কি বলেন, বিবেচনা করে দেখতে পারি। (১) নতুন বিষয়বস্তুর উপযোগী আঙ্গিক—অর্থাৎ 'নতুন বিষয়বস্তুর উপযোগী' নতুন আঙ্গিক। (২) আঙ্গিকসর্বস্ব লোক বলতে এমন লোক বোঝায় যার মানসিক ঐশ্বর্য নেই, এমন লোক যে কথা বলতে জানে অথচ যার কোনো বক্তব্য নেই। (৩) আঙ্গিকসর্বস্বতার অর্থ আঙ্গিক সম্বন্ধে আগ্রহ নয়, আঙ্গিকসর্বস্বতার অর্থ বিষয়বস্তুর অনুপস্থিতি। বিষয়বস্তুর উপযোগী আঙ্গিক—অর্থাৎ প্লেটোর বলটাও যেমন Perfect আঙ্গিক পেয়েছে—এবং সুন্দর হয়েছে, তেমনই র‍্যাকেটটিও। র‍্যাকেট যদি বিষয় হয়, তাহলে তার আঙ্গিক ওর চেয়ে বেশি সুন্দর আর কিভাবে হতে পারে? এই দুই-এর মাঝে—অর্থাৎ প্লেটো Aristotle ও আধুনিক যুগের মাঝে দুহাজার বছর কেটে গেছে। এবং আজ থেকে প্রায় চারশ' বছর আগে নিজের হাতে গড়া দূরবীন যন্ত্র দিয়ে গ্যালিলিও আবিষ্কার করেন—বৃহস্পতি গ্রহটির চারপাশে বেশ কিছু উপগ্রহ ঘুরছে এবং কোপারনিকাস ও গ্যালিলিও প্রমাণ করেন—অতি দুঃসাহসেরই কথা—যে সূর্য একটি নক্ষত্র এবং তার চারপাশে পৃথিবী ঘুরছে। পৃথিবী স্থির নয় ও সূর্য কস্মিনকালেও পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে ঘোরে না। অর্থাৎ—এরপর—র‍্যাকেটটিও তার আঙ্গিকের সৌন্দর্য লাভ করল। এতদিন ভাবা হত র‍্যাকেট কি আর বলের মতো সুন্দর হতে পারে! এবং এরপর থেকে 'বিষয়' নিজেই অন্যরকম হয়ে গেল। এবং পৃথিবী সৃষ্টির রহস্য সম্বন্ধে চিন্তা ভাবনার অদল-বদল ঘটে যাওয়ায় 'বিজ্ঞান' পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে সত্যকে উদ্ধার করার চেষ্টা শুরু করল। অর্থাৎ, 'deductive'—infernce from general to particular-এর পরিবর্তে—'inductive' অর্থাৎ inference from particular to general—এই পদ্ধতিতে সব কিছু পর্যালোচনা করার পদ্ধতি স্বীকৃত হল। গ্যালিলিওর পর যে এই পদ্ধতিই বিশ্ববোধকে জাগ্রত করেছে—এ আমরা সবাই জানি। একজন স্কুলের ছাত্রও জানে। Aristotle-ই বলুন, আর ভারতীয় ঋষীদের কথাই বলুন—ও'দের

বিশ্ববোধ—অর্থাৎ বিশ্ব ও বস্তুর ফর্ম সম্বন্ধে ধারণা বদলে গেল এর পর থেকে। ফলে সর্বত্র—কি বিজ্ঞান, কি ললিতকলায়, কি সমাজ দর্শন সব কিছুতেই ওলটপালট ঘটে গেল। আর সে কারণেই টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙ্গে গেল ঐ ক্লাসিক্যাল ধ্যান ধারণা। বিষয় রূপান্তরিত হল।

নতুন বিষয় গড়ে উঠলো আর নতুন বিষয়ের উপযোগী আঙ্গিকও গড়ে উঠল। অর্থাৎ বিষয়ের Container—আঙ্গিক এটা আমরা মেনে নিলাম। এক সময় ভাবা হত স্ফটিক, হীরে, মুক্তো—এসব ঈশ্বর মানুষের জন্যে সৃষ্টি করেছেন। এ সবই ঈশ্বরের অপরূপ সৃষ্টি। অন্যান্য সব বস্তুর মতো এসবও স্বয়ম্ভু। তখনও আমাদের বিবর্তনের ইতিহাস জানা ছিল না। এ সবকে চিরবস্তু ভাবা হতো। ডালটন সাহেব—এই ক্ল্যাসিকাল চিরবস্তুর গোঁড়ায় ধোঁয়া দিয়ে জানালেন—মাত্র আটানব্বুই রকম ধুলো-ই নাকি চিরবস্তু। পরে আরো কিছু ধুলোকণা বেড়ে তা এখন বোধ হয় ১০৬টি হয়েছে। এ সব বিজ্ঞানের ছাত্ররা সবাই জানেন। ঐ Inductive পদ্ধতিতে বিচার করে দেখা গেল যে কিছু মৌল ধূলিকণার এক আশ্চর্য সমন্বয়ই হল হীরে—ঈশ্বর যদি কিছু দিয়ে থাকেন তাহলে কিছু ধুলো ছড়িয়ে দিয়েছিলেন মাত্র। আমি বিজ্ঞানের ছাত্র নই। কাজেই হীরের প্রতিটি অণুর ঝকঝকে সমতলযুক্ত চতুষ্কোণ-বিন্যাসের ভিতরকার বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়াটি বোঝাতে পারব না। কতটা তাপ, কতটা সময় ও কতটা চাপের মধ্যে থেকে এক একটি কার্বন (কয়লা) অণু ঐ প্রকার চৌকো ও সমতল আকার ধারণ করেছে ও দ্যুতিমান হয়েছে—তা এক বৃহৎ পরীক্ষা-নিরীক্ষার ব্যাপার। এসব পরীক্ষা-নিরীক্ষা গবেষণাগারে অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে হয়েছে ও হচ্ছে।—মূল কথা হল, অ্যাটমের ঐ অদ্ভুত বিন্যাসই—বহু রকম Processing-এর মধ্য দিয়ে হীরের আকার ধারণ করেছে। অর্থাৎ, এভাবে আমরা বলতে পারি যে বিষয়, কার্বন অণু (অন্য অণু নয়) চাপ, তাপ, সময়ের মধ্যে থেকে ঝকঝকে চতুষ্কোণ আকার ধারণ করে হীরের রূপ নিয়েছে এবং দ্যুতি ছড়াচ্ছে। তারমানে বিষয় ও বিন্যাসের সঙ্গে আকারের সম্পর্ক অঙ্গাঙ্গী। অর্থাৎ আঙ্গিক জিনিষটা হয়ে ওঠে বিষয় ও সেই বিষয়ের বিন্যাসের প্রক্রিয়া বা কৌশলের নিহিত সর্তের ওপর। সেই জন্যেই হীরের মতো কোনো জিনিষ হীরে নয়।—সব বস্তুই, ভিন্ন-ভিন্ন অণুর ভিন্ন ভিন্ন সময়য়-ইত্যাদির রূপাকার। আধুনিক যুগে [গ্যালিলিওর পর থেকেই আধুনিক যুগের শুরু বলে ধরছি—কেননা, ঐ সময় থেকে মানুষ নিশ্চিত হল যে সূর্যই স্থির এবং পৃথিবী ইত্যাদিরা তার চারপাশে ঘোরে] ফর্ম বা আঙ্গিক একটা বিরাট প্রশ্ন। যে মুহূর্তে ডালটন সাহেব বলেছিলেন সামান্য কয়েকটি ধুলোকণা—Dulton Dust ছাড়া আর কোনো চিরবস্তু নেই—তখন আমাদের আগের সব বিস্ময়কর ও মাধুর্য-মণ্ডিত বিশ্ব-চিন্তা ভেঙে ধুলো হয়ে গেল। পুরোনো বিশ্ব-বোধ প্রায় ফ্যানটাসীতে রূপ নিল। পাশাপাশি নতুন যে বিশ্ববোধ—তা Inductive পদ্ধতিতে ক্রমশ বাড়তে থাকল। ফলে অজস্র রকম আঙ্গিকের বস্তু আমরা পেলাম, যার প্রতিটিই ভিন্ন ভিন্ন অণুর সময়য়ে গড়ে ওঠা। ঐ ১০৬টি ধূলিকণা—অর্থাৎ মৌল বস্তু—সহস্র রকম বিষয় ও আঙ্গিকে বিদ্যমান রয়েছে বলে জানলাম। চাঁদ, তারা, গ্রহ, নক্ষত্র—সবই।

তাহলে ব্যাপারটা দাঁড়ালো বিষয় বা মৌল বস্তু—বা মর্মবস্তু বা theme—একটা আঙ্গিক পাওয়ার আগে—অর্থাৎ হীরে বা মুক্তো বা জল বা নক্ষত্র হয়ে ওঠার আগে চাপ, তাপ, সময় ইত্যাদির ভিতর দিয়ে বিন্যস্ত হয়। না হলে ঠিক ঠিক আঙ্গিক পাওয়া—যে কোনো একটার অভাব হলেই পায় না। ঈপ্সীত আঙ্গিক না পেয়ে অন্যরকম হয়ে যায়। হীরে হয়ে উঠছে এরকম কয়লা দেখা যায়—কিন্তু তা কেউই হীরের মূল্যে সংরক্ষণ করে না। অর্থাৎ বিষয়—বিন্যাস—আঙ্গিক,—এই তিনটির সমন্বয় ও মিশ্রণের ফলে আমরা একটা সম্পূর্ণ—স্বয়ংসম্পূর্ণ বস্তুকে আলাদা করে চিনতে পারি। অর্থাৎ মুক্তো ও হীরের আলাদা আলাদা identification হয়। কয়লা, কীট, কালোতারা—এভাবেই identified হয়। সব কিছুই হয়। এমনকি জীবপ্রকৃতি, মানুষ এসবও হয়। এমনকি এদের আবেগ অনুভূতিগুলিও হয়। ঈশ্বর যদি কিছু মৌলবস্তু কোনো কালে সৃষ্টি করে থাকেন—তবে তা Dulton-Dust—১০৬ রকম ধুলো। এখন প্রশ্ন হচ্ছে (১) পুরোনো বিষয়ের জন্যে পুরোনো আঙ্গিক ও (২) নতুন বিষয়ের জন্যে নতুন আঙ্গিক—এটা বলতে আমরা কি বুঝবো। আবার (১) পুরোনো বিষয় ও আঙ্গিক নির্দ্ধারিত হত Deductive পদ্ধতিতে ও (২) নতুন বিষয় ও আঙ্গিক নির্দ্ধারিত হয় Inductive পদ্ধতিতে—এটাই বা কিভাবে ব্যাখ্যা করব। এবং (১) কবিতা বলতে আমরা কি বুঝবো (২) সাহিত্যের অন্যান্য মাধ্যমগুলির সঙ্গে তার পার্থক্য কিভাবে চিহ্নিত করব।

খুব সহজে এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেওয়ার সাধ্য আমার নেই। ওপরের প্রশ্নগুলির মীমাংসার জন্যে একজন ব্যক্তির সমগ্র জীবনই কেটেযেতে পারে। এর কোনো একটি প্রশ্ন নিয়ে মীমাংসা করতে গেলে সবগুলি প্রশ্নই জড়িয়ে যাবে ও তারও মীমাংসা করতে হবে। আগেই আমি মোটা দাগে বিশ্ববোধকে দু'ভাগে ভাগ করেছি। গ্যালিলিও-এর পূর্ববর্তী কালকে প্রাচীন কাল ও পরবর্তী কালকে আধুনিক কাল বলে চিহ্নিত করেছি। সূর্য ও সৌরমণ্ডলকে 'একক' ধরে এই কাল ভাগ। প্রাচীন কালে সূর্য পৃথিবীর চারপাশে ঘুরতো, এখন পৃথিবী সূর্যের চারপাশে ঘোরে। প্রাচীন কালে ব্রহ্মের মুখ থেকে বাণী নিসৃত হত, এখন মানুষের জীবন ও অভিজ্ঞতা থেকে সাধারণ সূত্র হিসেবে সাধারণ অভিজ্ঞতা গড়ে ওঠে। আগে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও তার প্রতিনিধি রাজা ও পুরোহিত শ্রেণী এক 'ক্ল্যাসিকাল' সমাজ গড়েছিল। এখন ঐ 'ক্ল্যাসিকস্'-এর অর্থ বদলে গেছে। আগে 'Art' নামে কিছু ছিল না, Artisan শ্রেণী একটা দক্ষ শ্রমিকের চেয়ে বেশি কিছু ছিল না—এখন Art একটা স্বতন্ত্র identification পেয়েছে। এখন 'Art' 'শিল্প' হয়েছে। আগে সমাজে ফিউডাল ব্যবস্থা ছিল—এখন সমাজ গণতন্ত্র সমাজতন্ত্র, কল্যাণমূলক রাষ্ট্র, সমাজতন্ত্র ইত্যাদির জন্যে চিন্তা ভাবনা করে। তা হলে, এটা খুবই সহজে অনুমান করা যায় যে—নতুন বিষয় হয়েছে ও তার জন্যে নতুন আঙ্গিকের প্রয়োজন। ধরা যাক নতুন বিষয় গণতন্ত্র এবং তার আঙ্গিক পার্লামেন্ট। এই গণতন্ত্র এবং পার্লামেন্টের সাথে আছে এক সামাজিক নতুন বিন্যাস। আমরা শুধু পার্লামেন্টারী ব্যবস্থা দেখেই বলে দিতে পারি না যে তা খুব সুন্দর গণতন্ত্র। আমরা গণতন্ত্রের

প্রতি প্রতিটি মানুষের বোধের সমন্বয় কতদূর ও তার বিন্যাস কত ভালো—তা দেখেই কেবল বলতে পারি গণতন্ত্র সুন্দর না অসুন্দর। এবং বলাই বাহুল্য যে পার্লামেন্টারী ব্যবস্থাও সেখানে সুন্দর হতে বাধ্য হবে। তেমন কবিতার মতো আঙ্গিক দেখেই আমরা বলে দিই না যে তা খুব সুন্দর কবিতা হয়েছে। আমরা বিশ্বাসযোগ্য কল্পনা, আবেগ, অনুভূতি ও তার সূক্ষ্ম ও প্রাঞ্জল বিন্যাসও চাইব। চারশ বছর আগে পর্যন্ত আমাদের সমাজ-জীবন, বোধ বুদ্ধি 'নিয়তি' তাড়িত ছিল। গ্রীক নাটকের 'নেমেসিস' বস্তুত সমাজ-জীবনের 'নেসেসিস'। আড়াই হাজার বছর আগে গড়ে ওঠা বিশ্ববোধ ও সমাজ-দর্শন চারশ বছর আগে পর্যন্ত—প্রায় দুহাজার বছর ধরে পৃথিবীতে প্রচলিত থেকেছে। গ্যালিলিও থেকে যে আধুনিক যুগের সূচনা ধরেছি, সেই আধুনিক যুগকে ঐ পুরোনো ও বিগত যুগের পরিপ্রেক্ষিতে 'শিশুকালই' বলা চলে। পুরোনো যুগের মানুষের সামাজিক ও মানসিক জটিলতা কম ছিল। সবচেয়ে হতমান মানুষ নিজেকে ভাগ্যহীন ও ঈশ্বরের করুণা-বঞ্চিত ভাবতে পারলেই সুখী ছিল। সামন্ত কাঠামোতে ব্যক্তি সত্তার কোনো মূল্য ছিল না। সমাজের আঙ্গিক সে কারণেই এক চূড়ান্ত নিঁবিরোধী আঙ্গিকে বাঁধা ছিল। ঈশ্বর, রাজা, পুরোহিত ও তাদের ঐশ্বর্য, শক্তি, মাহাত্ম্যর কাছে মানুষের অহং অতি তুচ্ছ ব্যাপার ছিল। বড় জোর সেই অহং 'সেই অহং'-এ পরিণতি লাভ করে তৃপ্তি পেত। ব্যক্তিগত শোক, কষ্ট, মনোবেদনা, দুঃখ দুর্দশা ছিল নিয়তি তাড়িত। এ হল সামন্ত সমাজে গড়ে ওঠা মানুষের চিত্তের 'ফর্ম' বা আঙ্গিক। ফলত এক 'ক্ল্যাসিক্যাল' ফর্মকে তখন মানুষ গড়ে তুলে তার মধ্যে আশ্রয় নিয়েছিল। এবং ঐ ফর্ম ঐ যুগের পক্ষে মানানসই হয়েছিল। রুচি ও মূল্যবোধকে নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম এমন এক deductive দর্শন—যেমন কৃষ্ণেরই সব লীলা—মানুষ তাঁর হাতের পুতুল—যেমন খেলাচ্ছেন তেমনি খেলছি—অর্থাৎ General to Particulars সিদ্ধান্তের মধ্যে বেঁধে রাখার দর্শনের উদ্ভব হয়েছিল। 'পৃথিবী সূর্যের চারপাশে ঘুরছে'—এরকম মারাত্মক কথার প্রতিক্রিয়ায় ঝড় বয়ে গিয়েছিল সমাজে। সব প্রাচীন মূল্যবোধকে ধ্বসিয়ে দিয়ে নতুন সামাজিক মূল্যবোধ গড়ে তোলার পরিপ্রেক্ষিতে Inductive যুক্তিবিদ্যার জন্ম হয়েছিল। এই Inductive যুক্তিবিদ্যার ফলেই ক্ল্যাসিসিজম 'গেল ফাটি হাজার গাঁতে'। সমাজে নতুন 'ফর্ম' এল। ওথেলো বুঝল যে নিয়তি নয়, নিজের ভুলে রুমাল ফেলে যাওয়ার ফলেই তার পতন হয়েছে। মানুষের স্বভাবেই আছে ট্রাজেডির বিষ, সিজার বুঝল যে 'Mob'-ই তার পতনের কারণ। 'Mob' তাকে সিংহাসন চ্যুত করতে পারে, তার জীবনে ট্রাজেডি ঘটাতে পারে। 'Mob'-ই ঈশ্বর। সাহিত্যে এ এক আশ্চর্য নতুন সংবাদ। সমাজের আদল পাল্টানোর যুগ শুরু হয়ে গেছে। গণতন্ত্রের বোধ গড়ে উঠতে শুরু হয়েছে। ইতিহাস ও সমাজ বিজ্ঞানের কৌতূহলী পাঠক তা আমার চেয়ে অনেকগুণ বেশি জানেন—জানাই স্বাভাবিক। 'আঙ্গিক'—সমাজে ও শিল্পে-কিভাবে আসে কিভাবে নতুন বিষয় নতুন সমাজ-বোধের জন্ম দেয়, কিভাবে সেই সমাজবোধ নতুন ব্যক্তি চেতনাকে জাগ্রত করে, কিভাবে ঐ ব্যক্তি চেতনা শিল্পে সক্রিয় হয়ে নতুন কাব্য কাঠামো গড়ে তোলে—এটা একরকম মহান বিষয়। এ বিষয়ে চমৎকার

অনেক বই আছে, আমি খুব সামান্য দু'একটি দেখেছি মাত্র। এখানে আমি রামায়ণ, মহাভারত, ইলিয়াড, ওডিসি ইত্যাদিকে পুরোনো বিষয়ের জন্যে পুরোনো 'আঙ্গিক'-এর মধ্যে ফেলেছি। অর্থাৎ মহাকাব্যগুলোকে ধরেছি। তাছাড়া, রাজপুরুষদের তৃপ্তির জন্যে, অভিজাত শ্রেণীর রুচির জন্যে যে সব সাহিত্য রচিত হয়েছিল—ধরা যাক কালিদাস, তার কাব্য কাঠামোকেও আমি ঐ পর্যায়ের মধ্যে ফেলতে পারি। এ সব 'ক্লাসিক্স'। কিন্তু, এখন আর এরকম বিষয় বিন্যাস তথা আঙ্গিকে কাব্য রচনা সম্ভব নয়। পাতার পর পাতা জুড়ে গোরীর রূপ বর্ণনা যতই errotic হোক, তা আর ভালো লাগে না। আমাদের রাজকীয় উল্লাস, সময় ব্যভিচার প্রবণতা ও যৌন যোগ্যতা নেই। গোরীর রূপে আমরা ক্লান্ত হয়ে পড়ি। —যাই হোক, এ সব Deductive পদ্ধতির আঙ্গিক। classical আঙ্গিক। Inductive পদ্ধতির আঙ্গিকের বীজ কিন্তু লিরিক কবিতার মধ্যে বহুদিন ধরেই উপ্ত ছিল। এই রচনার '১' অংশে 'লিরিকের স্বাধীনতা' প্রসঙ্গে এক বেয়াকুফ কবির উল্লেখ করেছি—যিনি যুদ্ধে রাজার বীরোচিত মৃত্যু, রাজ-অনুজ্ঞা, মহান অভিজাত শ্রেণীর জয়গান, ঈশ্বরের আশীর্বাদ বিষয়ে গীত—এসব জরুরী না মনে করে নিজের যুদ্ধ ক্লান্তি, মদ্যপানের সুখ, প্রেমিকার জন্যে মন উসখুস অবস্থা—এ সবই জরুরী মনে করে পদ্য লিখেছিলেন। বহুকাল আগে থেকেই deductive পদ্ধতিতে গড়ে ওঠা ক্লাসিকাল কাব্য কাঠামোর পাশাপাশি এক খুচরো কাব্য-কাঠামোও লালিত পালিত হচ্ছিল। এই কাব্য কাঠামোর motif-ও ছিল General to particular। রাজার মাহাত্ম্য, দেবতার মাহাত্ম্য প্রকাশের পূর্ব সর্তকে গানে রূপান্তরিত করে জন-মানসে সঞ্চারিত করাই ছিল এর উদ্দেশ্য। কিন্তু, তার খুচরো শরীরে ঢুকে গেল ব্যক্তি-অভিলাষ; যা পরবর্তীকালে—গণতন্ত্রবোধ, ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য বোধের কালে খুবই উপযুক্ত কাব্য-কাঠামো হয়ে উঠল। আমরা জানি যে 'ক্লাসিসিজম' ডিডাক্টিভ পদ্ধতিতে গড়ে ওঠা আঙ্গিক—এবং এর মধ্যে ব্যক্তি-অভিলাষের তুচ্ছতার কোনো স্থান নেই। গণতান্ত্রিক সমাজ-চেতনা ও মন এর মধ্যে পথ হারাবেই। ক্লাসিসিজম অনুপযুক্ত প্রমাণিত হল ও ফুরিয়ে গেল। লিরিক রূপান্তরিত হল নতুন কাব্য-আঙ্গিক হয়ে। পরবর্তীকালে —এবং সম্প্রতিকালে 'Big humming Chaos of Existence'-এর যুগেও লিরিকের আঙ্গিকই নানাভাবে ভেঙেচুরে—নতুন নতুন চেহারা নিচ্ছে। কবিতার আঙ্গিক মানে—লঘু ত্রিপদী, দীর্ঘ ত্রিপদী, পয়ার, মহাপয়ার, সনেট, মহাসনেট—এরকম আমি মনে করি না। এ দিয়ে কবিতাকে চেনা যায়—এই মাত্র। আসলে, আঙ্গিক বলতে বুঝি আধারকে, সেই আধার কোনোটা চৌকো, কোনোটা লম্বাটে, কোনোটা লম্বা ও গোল হতে পারে—। যার মধ্যে ব্যক্তি-মনের একান্ত টুকরো ব্যক্তি-গত অনুভূতি, স্বপ্ন, আকাঙ্ক্ষাগুলি ধরা পড়ে—লিরিক বলতে আমি এই মন্ময়তাকেই বুঝি।

যদি প্রশ্ন ওঠে গদ্যের আকারে যে টুকরো কবিতাগুলো লেখা হচ্ছে, ওগুলোও কি লিরিক? আমি বলব, হ্যাঁ, তা হতেই পারে—যদি তার মধ্যেই মন্ময় সুরের ধ্বনিটি থাকে; —এবং দেখা যায় যে সত্যিই তা থাকে। তাহলে আমরা ত্রিপদী বা দ্বিপদী

পয়ার ছেড়ে গদ্য-কাঠামোতে লিরিক সাজাবো কেন? কেন প্রচলিত লিরিকের চেহারাগুলি বর্জন করব? —এ ক্ষেত্রে বলার কথা হল (১) লিরিকের পুরোনো চেহারাগুলো ব্যবহারে ব্যবহারে 'ক্লিশে' হয়ে গেছে (২) ঐ চেহারার আটোসাঁটো অবস্থা অনেকের আবেগ-মোক্ষণের সহায়ক না হয়ে শৃংখলা বা আরো খারাপভাবে বললে 'শেকল' বলে মনে হতে পারে। (৩) নতুন সংবাদ, জ্ঞান, অভিজ্ঞতা, বিবৃতি, যা অতি সূক্ষ্মভাবে প্রতিনিয়তই—flash করছে, তাকে ঐ চেহারার মধ্যে বেঁধে ফেলতে অনেকের অসুবিধা হতে পারে (৪) নতুন চেহারাও একরকম নতুন সংবেদন তৈরী করে, মানুষের আধুনিক রুচি এই সংবেদন চায়—যেমন পোশাক-পরিচ্ছদ, কসমেটিকস্—ইত্যাদির ব্যাপারে আমরা দেখেছি যদি তা রুচিকর ও মানানসই হয়। (৫) অনেক বাড়তি ব্যাপার—যেমন ওপরে ভেসে থাকা ছন্দ, লয়, বা নানান অলংকার—এ সব ঝরিয়ে দিয়ে কবিতাকে নির্ভার করার প্রবণতা ও সহজ সুন্দর হওয়ার ইচ্ছে থেকেই লিরিক হয়ত গদ্যে রূপ নিচ্ছে। (৬) Inductive পদ্ধতিতে —অর্থাৎ Particular to General হতে গিয়ে লিরিক অনেক রকম পরীক্ষা-নিরীক্ষার সুযোগ করে দিয়েছে। —এতো গেল সহজ কয়েকটি কথা—কিন্তু—পরীক্ষার-নিরীক্ষার নামে আঙ্গিকের ওপর কোনো কবির অযথা ঝোঁক এসে গেলে তা হবে—স্রেফ আঙ্গিকসর্বস্বতা। মর্মবস্তু ও তার বিন্যাসেই আঙ্গিক গড়ে উঠবে। গদ্যের আঙ্গিকে লিরিক যদি এ দিক থেকে সফল হয় তো তা হবে—খুব মোটা কথায় আধুনিক। আকারে-ইঙ্গিতে তো সে আধুনিকই, কেননা, আধুনিক কালে সৃষ্ট গদ্য-সাহিত্যের সুযোগগুলি সে ব্যবহার করতে পারে। অর্থাৎ গদ্য 'ডিকশন' বা বাক্ বিন্যাস কবিতাকে কিছুটা মুক্তি দিতে পারে। তাহলে ব্যাপারটা কি দাঁড়াল এখন? একটা চমৎকার ব্যাপার দাঁড়াল—কবিতার দুটিই মাত্র আঙ্গিক পেলাম আমরা (১) deductive পদ্ধতিতে গড়ে ওঠা Classical আঙ্গিক (২) deductive পদ্ধতি থেকে সরে এসে inductive পদ্ধতিকে প্রশ্রয় ও পৃষ্ঠপোষণ করতে সক্ষম লিরিক কবিতার আঙ্গিক।

কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে—এই সিদ্ধান্তের মাধ্যমে এক বিশাল, প্রবহমান কালের কাব্য-কাঠামোকে খুব মোটা দুটি দাগে তো আলাদা করা হল; এখন এই সহজ সিদ্ধান্ত তত সহজ থাকে না—অন্তত Inductive পদ্ধতিতে তো নয়ই। আমরা ভুলে গেছি যে লিরিক কবিতা নিজেই একটা আঙ্গিক যা ক্লাসিক কবিতার আঙ্গিকের থেকে আলাদা। ক্লাসিক কবিতার আঙ্গিক নিয়ে আমরা মাঝে মধ্যে হঠাৎ ভেবেছি—যখন যখন আমাদের মধ্যে অধিবাস্তব বা Metaphysical (Meta মানে বস্তুর বাইরের অন্য কোনো সত্তা) মনোভাব এসে চাগাড় দিয়েছে। তখন আমরা কিছুটা ডিডাক্টিভ হয়ে পড়েছি। কিন্তু, আধুনিক যুগের মানসিক প্রবণতার জন্যেই লিরিক কবিতার আঙ্গিক (যা নিজেই এক স্বয়ংসম্পূর্ণ আঙ্গিক)-এর নানান হের-ফের ঘটাতে চেয়েছি আমরা। কোনটা বেশি সুবিধাজনক কোনটা বর্তমান যুগের hum drum chaos-এর সুরটাও ধরতে পারে, কোন পদ্ধতিতে মন্ময় ধ্যান (ধ্যান মানে উৎকল্পনা নয়—বলাই বাহুল্য) বা আধুনিক জীবনের উদ্বেগ, উৎকল্পনাও ধরা সম্ভব হয়—এই সব নিয়ে

তন্ময় কবিতাই—এক কথায় লিরিক কবিতা। ছন্দ মিলের কাঠামোয় গড়া হোক বা না হোক তা লিরিক কবিতাই। এখানে, জগদীশ ভট্টাচার্য-র 'কবিতা' নামক রচনাটি থেকে একটা যুৎসই উদ্ধৃতি তোলা যাক 'গীতি কবিতার বাহন হল ছন্দোময় ভাষা। সেই ছন্দ অতিনিরূপিত পদ্য ছন্দও হতে পারে, আবার অনতিনিরূপিত গদ্যছন্দও হতে পারে।' প্রসঙ্গত তিনি আরো বলেছেন 'গদ্য ছন্দকে রবীন্দ্র বলেছেন ভাবের ছন্দ। এই ভাবের ছন্দ অতিনিরূপিত নয় বলেই তার শিল্প রূপ সৃষ্টি সহজ সাধ্য নয়।' আবার ঠিক এর বিপরীত কথা বলেছেন অরুণ মিত্র তার একটি অবশ্যপাঠ্য রচনা 'কবিতা, আমি এবং আমরা'--তে। (রচনাটি পরমা পত্রিকার শরৎ-হেমন্ত ১৩৮৪ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।) সেখানে অরুণ মিত্র বলেছেন "প্রথাগত ছন্দ মিলের কাঠামোর মধ্যে আমি গোড়া থেকেই অস্বস্তি বোধ করেছি।··· আমি যা বলতে চাই তা ঐভাবে ঠিক বলতে পারছিনা, এই ছিল অস্বস্তির কারণ।" অর্থাৎ জগদীশ ভট্টাচার্য গদ্য কাঠামোতে লিরিক লেখা যখন 'সহজ সাধ্য নয়' বলে মনে করেন, তখনই অরুণ মিত্র মনে করেন, নিজের অভিজ্ঞতা থেকে, যে ছন্দ মিলের কাঠামোই তার অস্বস্তির কারণ। বরং গদ্য কাঠামোতে তাঁর যা বলার কথা তা স্বস্তির সঙ্গে বলতে পারেন। কেননা তাঁর মনে হয়েছে 'মিল যতখানি সাহায্য ধ্বনি-বিন্যাসে করতে পারে, তার চেয়ে অনেক বেশী ক্ষতি করতে পারে, কবিতার।' তিনি আরো বলেন 'অনেক বাধা আছে : শব্দের দারিদ্র, অনুভূতির পলায়নতা, বোধের অস্বচ্ছতা ইত্যাদি। তার ওপর কেন আর যান্ত্রিক বাধা' ? ছন্দ মিলের প্রথাগত লিরিক কাঠামোকে, অতএব, তাঁর যান্ত্রিক বাধা বলে মনে হয়েছে। জগদীশ ভট্টাচার্য বা অরুণ মিত্র দুজনেই শ্রদ্ধেয় কবি। একজন লিরিকের প্রথা-বিরোধী গদ্য কাঠামোকে কবিতার পক্ষে 'সহজসাধ্য' মনে করেন না, অপরজন লিরিকের প্রথা বিরোধী গদ্যকাঠামোকে সহজসাধ্য বলে মনে করেন। অতএব লিরিকের কাঠামোর ব্যাপারে এই দ্বন্দ্ব বেশ প্রবল বলেই মনে হয়। আমরা আধুনিক কালে ষাট—সত্তরেও এ দ্বন্দ্ব দেখছি। ষাট যদিবা গদ্যে স্বস্তি পেল, তো সত্তরে পদ্য কাঠামো এল।

আগেই বার বার বলেছি, Inductive যুক্তির জয় জয়াকারের যুগে—লিরিকই কবিদের প্রধান কাব্য-বাহন হল। যদিও Inductive পদ্ধতি ও deductive পদ্ধতি সমবয়সী। কিন্তু, আধুনিক কালের সূচনা থেকে—সত্যকে যাচাই করার পদ্ধতি হয়ে উঠল inference from Particular to General। এ কারণেই, এখনই আমরা বলে দিতে পারিনা যে লিরিকের পক্ষে পদ্য কাঠামো না গদ্য কাঠামো সবচেয়ে বেশি সুবিধেজনক। এখনও লিরিকের ক্ষেত্রে পদ্য-কাঠামোর সুবিশাল ঐতিহ্য আছে। লিরিকও একদা deductive পদ্ধতির পূর্ব নির্দ্ধারিত সত্যকেই পোষণ করেছে ও তার বাহন হয়েছে। সে কারণে তার মধ্যেও এক রকম classical tone ও ঐতিহ্যের সংস্কার থেকে গেছে। এসব আমাদের স্নায়ুকে, মনকে এখনও দুর্বল করে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে : 'নতুন দৃষ্টি ও বক্তব্যের চাপে পুরোনো ছাঁচ ভেঙে যায়। কাব্যের ক্ষেত্রে এটা স্পষ্ট। আধুনিক পর্বারম্ভের

সময় থেকে কবিতার প্রথাগত গঠনে ভাঙন শুরু হয়। কারণটা সহজ। নিয়মিত পংক্তিমিল ইত্যাদি ইত্যাদি কবিতা রচনায় যেমন সাহায্য করে, তেমন অনেক সময় বিপথগামীও করে, কখনওবা যান্ত্রিকতা চাপিয়ে দেয়। তাছাড়া কবিতার হিসেব-করা নক্সার মধ্যে অনুভবকে অথবা বক্তব্যের বিশেষ মেজাজকে সব সময়ে আঁটানো যায় না।"—অরুণ মিত্র অন্যত্র আর একটি রচনা 'কবিতা কী বলে কীভাবে বলে'-তে এ কথা বলেছেন। 'নতুন দৃষ্টি ও বক্তব্যের চাপে পুরোনো ছাঁচ ভেঙে যায়,' —'আধুনিক পর্বারম্ভের সময় থেকে প্রথাগত গঠনে ভাঙন শুরু হয়'—তাঁর এই মন্তব্য দুটি লিরিকের আঙ্গিকের পুনর্বিন্যাসকেই ইঙ্গিত করছে। 'নতুন দৃষ্টি ও চাপে' পুরোনো ছাঁচ ভাঙছে। অযথা, অপ্রয়োজনে ভাঙছে না। এবং এই ভাঙন অপরিহার্য, কেননা, 'নতুন দৃষ্টি'-জাত অনুভববৃত্ত, বক্তব্যের বিশেষ মেজাজকে 'হিসেব-করা নক্সা'র মধ্যে আঁটানো সম্ভবহচ্ছে না। এবং এ কারণেই 'যুক্তির অধীনে পর্যবেক্ষণশীল বিচারশীল বুদ্ধির ভাষা' গদ্য কবিতার বাহন হয়ে ওঠাই স্বাভাবিক। কিন্তু কবিতার গদ্য কেমন হবে ? এও এক প্রশ্ন। উপন্যাস ও প্রবন্ধের গদ্যে হয়ত গদ্য ভাষা 'যুক্তির অধীনে পর্যবেক্ষণশীল বিচারশীল বুদ্ধির ভাষা'। কিন্তু কবিতার মধ্যে তাকে সৃজনশীল কল্পনা ও অনুভূতির স্পন্দন একটু বেশী মাত্রায় ধরতে হয়। তখন যে ভাষা, সেই গদ্যভাষা কেমন হবে ? এবং এর ফলে গদ্য কাঠামোর লিরিক কেমন হবে ? সুশীল রায় তাঁর 'জীবন ও কবিতায়' লিখেছেন 'গদ্য কবিতারও সে ছন্দ আছে এবং সে ছন্দ যে দুরূহতর তা বুঝবার মতো বুদ্ধি আমাদের থাকা দরকার। এই কবিতা স্ক্যান করা যায় না, কান দিয়ে ধরতে হয় এই ছন্দ।' তার মানে, উনি হয়ত বলতে চেয়েছেন, কবিতায় যে গদ্য ব্যবহৃত হবে তারও একটা অন্তর্নিহিত ছন্দ থাকবে, যা কানে, অনুভবে ধরা পড়বে। আসলে, খুব গভীর অনুভূতির স্বচ্ছ কথার মধ্যে আপনা থেকেই একটা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ছন্দ থাকে। এটা স্বভাব ছন্দ। রবীন্দ্রনাথ একে ভাবছন্দ বলেছেন। এ কথা এ রচনায় আগেই উচ্চারিত হয়েছে।

আঙ্গিকের আলোচনাটি এতক্ষণ খানিকটা ছন্দ ঘেসা হয়ে গেল। যাওয়াটাই স্বাভাবিক।

আঙ্গিক প্রসঙ্গে ছন্দ, ভাষা, রীতির কথা এসে পড়বেই। আঙ্গিক প্রসঙ্গে প্রাঙ্গিক আরো নানা কথা থেকে যায়। Walt Whitman এর প্রসঙ্গে তাঁর কবিতার আঙ্গিক সম্বন্ধে মন্তব্যকারীরা 'the formlessness' শব্দ ব্যবহার করেছেন, বলেছেন 'the utterly chaotic nature of the poem'। হুইটম্যানের পাঠক মাত্রই জানেন, যে তিনি হুড় হুড় করে কথা বলতেন, তাকে metre বা মাত্রায় বাঁধার বিন্দুমাত্র প্রবণতা তার ছিলনা। অর্থাৎ তাঁর 'প্যাশন' বা ভাবাবেগ তাঁকে তাড়িত করত। কিন্তু তাঁর ভাবাবেগ ছিল খুবই উদাত্ত, মহান, মানবতাবোধে দিব্য ও প্রাজ্ঞল—এবং তাঁর ধ্যানে ছিল গাঢ়তা। যে কারণে, তাঁর ঐ আপাত formlessness এক অসাধারণ ব্যক্তিত্বময় form হয়ে উঠেছিল। অর্থাৎ বিষয় বা মর্মবস্তুর গৌরবে ও তার প্রতি তাঁর ধ্যানে এবং ঐ মর্মবস্তু ও ধ্যানের বিন্যাসে ঐ 'formless' formটাই অপরিহার্য ছিল। এবং তাঁর ঐ form-এর মধ্যে নিহিত ছিল একটা 'motif'। ঐ

Motif-টা কি ? তিনি মানবাত্মার liberty চেয়েছিলেন, গণতন্ত্র চেয়েছিলেন, দেশাত্মবোধ ছিল তাঁর প্রবল

Each of us inevitable,
Each of us limitless—each of us with his or her right upon the earth,
Each of us allow'd the eternal Purports of the earth,
Each of us here as divinely as any is here.

বা

Liberty, let others despair of you—I never despair of you

বা

The immortal poets of Asia and Europe have done their work and passed to other spaces,
...
Any Period one nation must lead
One Land must be the promise and reliance of the future.

এশিয়া-ইউরোপে জাতীয় মহাকবিরা ছিলেন। উন্নত সংস্কৃতি ছিল, কিন্তু আমেরিকার ছিল না। তাঁর দেশপ্রেম থেকে যে প্রজ্ঞার জন্ম হয়েছিল 'Any period one nation must lead'—এ আজ ধ্রুব সত্য। উক্ত উদ্ধৃতিগুলির মতো বহু উদ্ধৃতি দিয়ে তাঁর motif-টা ধরা যায়। এক বেপরোয়া, স্বাধীন, জাতীয় ঐতিহ্যশূন্য মানুষ ছিলেন তিনি। তিনিই প্রথম 'আমেরিকান' জাতীয়তার সুরটি কবিতায় ধ্বনিত করেন। অর্থাৎ একটা নতুন কিছু গড়ে তোলার প্রবণতা ও প্রেরণা ছিল সদা জাগ্রত —তাঁর মন-মেজাজে। 'তিনি ১৮৫৫ সালে লিখিত Leaves of Grass'-এর ভূমিকায় একজায়গায় লিখেছেন—'Love the earth and the Sun···stand up for the stupid and crazy,···despise riches···hate tyrants ···have patience and indulgance towards the people···go freely with powerful uneducated persons···" ইত্যাদি। এসব সে সময় এক নতুন বাক্-প্রতিমার অপেক্ষা রাখেই। আপাত ঐ 'formless' ব্যাপারটা কিন্তু মোটেই unorganised নয়। এই organised formlessness—বস্তুত এক নতুন আঙ্গিক। যে কোনো মহৎ কবির মতো Whitman তাঁর নিজের প্রয়োজনে নিজের আঙ্গিক গড়ে নিয়েছেন। অর্থাৎ Personality, Walter Pater যার অপর নাম দিয়েছেন 'style'—আমি দেখছি 'personality' Whitman-এর ক্ষেত্রে form ও style এক সঙ্গে। Form সম্বন্ধে যে নানা কথা থেকে যায়, তার মধ্যে দেখা গেল personality-ও একটা কিছু। যার ইঙ্গিত কিছুটা অরুণ মিত্রে পেয়েছি। ব্যক্তিগত স্বস্তি / অস্বস্তির মধ্যে। তার মানে প্রয়োজন, ব্যক্তিগত স্বস্তি /

অস্বস্তি—অন্ততঃ এই দুটিই আধুনিক লিরিকের কাঠামোকে নিয়ন্ত্রণ করে,বলা যায়। এবং এদিক থেকে গদ্য কাঠামোর দিকে লিরিকের বিশেষ ঝোঁকটাও অনুধাবন করা যায়। গদ্য আধুনিকতম ভাব প্রকাশের ভাষা। তার মাধ্যমে ভাব-প্রকাশের খোলা জায়গা বেশি পাওয়া যাবে এটাই স্বাভাবিক। একেই হয়ত বলা যায় যে নতুন বিষয়ের জন্যে নতুন আঙ্গিক। যদিও তর্কের নিষ্পত্তি হয় না। এ বিষয়ে চমৎকার উদাহরণ হলেন বোদলেয়ার। তাঁর 'ক্লেদজ কুসুম'কে আধুনিকতার, বিষয়ের, বোধের আধুনিকতার প্রথম উদ্যত সঙ্গীত বলা যায়,—কিন্তু তার কাঠামোটা প্রথাবদ্ধ। যদিও, পরে তিনি গদ্য অঙ্গিকে সরে এসেছিলেন। প্রথাগত পদ্য কাঠামোতে রচিত হলেও ক্লেদজ কুসুমের মধ্যেকার আধুনিকতার ফ্রেভার নষ্ট হয়নি মোটেও। এই দ্বন্দ্ব আমাদের কবিকেও বেশ ভাবিয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের 'আধুনিক কাব্য' নামক রচনাটিতে দ্বন্দ্ব বেশ প্রকট। তিনি এক জায়গায় লিখছেন 'এখনকার দিনে ছাঁটা কাপড় ছাঁটা চুলের খট্‌খটে আধুনিকতা'—কেননা 'বলতে চায়ই, মোহ জিনিষটাতে আর কোনো দরকার নেই।' কারণ 'বিজ্ঞান তার নাড়ীনক্ষত্র বিচার করে দেখেছে, বলছে মূলে মোহ নেই, আছে কার্বন, আছে নাইট্রোজেন, আছে ফিজিওলজি, আছে সাইকলজি। আমরা সেকালের কবি, আমরা এইগুলোকেই গৌণ জানতুম, মায়াকেই জানতুম মুখ্য। তাই সৃষ্টিকর্তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছন্দে বন্ধে ভাষায় ভঙ্গিতে মায়া বিস্তার করে মোহ জন্মাবার চেষ্টা করেছি, এ কথা কবুল করতেই হবে।' 'আধুনিক দুঃশাসন জনসভায় বিশ্ব-দ্রৌপদীর বস্ত্র হরণ করতে লেগেছে, ও দৃশ্যটা আমাদের অভ্যস্ত নয়।'—উক্ত কথাগুলির শ্লেষ, উষ্মা ধরতে আমাদের অসুবিধে হয়না। কিন্তু তিনি বিবেচক, যাচাই করে দেখার মনও তাঁর ছিল। তিনিও ধরতে পারেন 'আধুনিক কালের মনের মধ্যেও তাড়াহুড়ো, সময়েরও অভাব। জীবিকা জিনিষটা জীবনের চেয়ে বড় হয়ে উঠেছে। ···যে মানুষ একদিন রয়ে সয়ে আপনার সংসারকে আপনার করে সৃষ্টি করত সে আজ কারখানার ওপর বরাত দিয়ে প্রয়োজনের মাপে তড়িঘড়ি একটা সরকারী আদর্শে কাজ-চালানো কাণ্ড খাড়া করে তোলে।' এ হল খুব দ্রুত বদলে যাওয়া দুই যুগের দ্বন্দ্বের কথা। ছন্দে বন্ধে রয়ে-সয়ে মায়াবদ্ধ সৃষ্টির মেজাজটিই যে হারিয়েছে—এটাই রবীন্দ্রনাথ বলতে চেয়েছেন। তিনি বলেছেন 'এই বৈজ্ঞানিক যুগের কাব্য ব্যবস্থায় যে ব্যয়সংক্ষেপ চলছে তার মধ্যে প্রধান ছাঁট পড়ল প্রসাধনে। ছন্দে বন্ধে ভাষায় অতিমাত্র বাছাবাছি চুকে যাবার পথে। সেটা সহজভাবে নয়, অতীত যুগের নেশা কাটাবার জন্যে তাকে কোমর বেঁধে অস্বীকার করাটা হয়েছে প্রথা।'—বলাই বাহুল্য, রবীন্দ্রনাথের উক্ত মন্তব্যে তাঁর নতুন কাব্য কাঠামোর প্রতি এক রকম বিরূপতা-ই লক্ষ করা গেল। বিজ্ঞানের বিচারে 'মোহের আবরণ তুলে দিয়ে যেটা যা সেটা তাই দেখতে হবে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে মায়ার রঙে যা রঙিন ছিল এখন তা ফিকে হয়ে এসেছে, সেই মিঠের আভাস মাত্র নিয়ে ক্ষুধা মেটেনা, বস্তু চাই।' —এসব মায়া-মুগ্ধ কবি রবীন্দ্রনাথের ভালো লাগেনা। 'আধুনিক কাব্য' আসলে আধুনিক রূপ-রীতির কবিতার এক বিরূপ সমালোচনা। কিন্তু তাঁর এই বিরূপতার মূল কারণ কি ? চৈতন্যের

দ্বন্দ্ব ? বস্তু নয়, বস্তুর মায়াই তাঁর কাছে বিষয়বস্তু। আর ঐ মোহ, ঐ মায়ার রূপরস, অর্থাৎ কিনা 'ঊনবিংশ শতাব্দী'র কাব্যভাবনা ও তার আঙ্গিক, রূপ প্রকরণ তাঁর ভালো লাগে। তবু, তিনি ঐ রচনাটির উপসংহারে বলেন 'আধুনিক বিজ্ঞান যে নিরাসক্ত চিত্তে বিশ্বকে সমগ্র-দৃষ্টিতে দেখবে, এইটেই শাশ্বতভাবে আধুনিক।' অবশ্য এই শাশ্বত বিশ্বরূপের কাব্যরূপ কি হবে, তা কিন্তু তিনি এখানে বলেননি। কিন্তু আমরা জানি যে গোলাপকে আমরা সুন্দর হতে বলার আগেই তা নিজ গুণে সুন্দর হয়েছে। সে সুন্দর কিনা তাও সে জানেনা, কেননা সে বস্তুর এক প্রাকৃতিক বিন্যাস জাত আঙ্গিক—নানা জটিল পদ্ধতিতে সে ঐ রূপ ধারণ করেছে। আমাদের চোখে ভালো লাগে এই যা ! আসলে এই ভালোলাগাটা মানুষের একক দৃষ্টিকোণ থেকে বড়ই আপেক্ষিক।

অঙ্গিকের প্রসঙ্গে বিষয়ের প্রসঙ্গ এসেই যাচ্ছে বারবার। কেননা, তা অবিচ্ছেদ্য। রবীন্দ্রনাথ তাঁর এ লেখায় উদাহরণ স্বরূপ আধুনিক এক মেয়ে কবি (মহিলা কবিটির নাম রবীন্দ্রনাথ করেন নি) সেকালের এক সুন্দরীকে নিয়ে লেখা (সামন্ত যুগের সুন্দরীকে নিয়ে লেখা ?) একটি কবিতার তর্জমা করেছেন, এবং বলেছেন, 'তর্জমায় মাধুরী সঞ্চার করলে বেখাপ হবে'—সেটা তুলে দেওয়ার লোভ সামলাতে পারছিনা। মনে রাখবেন 'তর্জমায় মাধুরী সঞ্চার করলে বেখাপ হবে'—কথাটি—

তুমি সুন্দরী এবং তুমি বাসি
যেন পুরোনো একটা যাত্রার সুর
বাজছে সেকেলে একটা সারিন্দি যন্ত্রে।
কিম্বা তুমি সাবেক আমলের বৈঠক-খানায়
যেন রেশমের আসবাব, তাতে রোদ পড়েছে।
তোমার চোখ আয়ুহারা মুহূর্তের
ঝরা গোলাপের পাপড়ি যাচ্ছে জীর্ণ হয়ে।
তোমার প্রাণের গন্ধটুকু অস্পষ্ট, ছড়িয়ে পড়া,
ভাঁড়ের মধ্যে ঢেকে-রাখা মাথাঘসা মসলার মতো তার ঝাঁজ।

আমি জানি না এই কবিতাটিতে আর মাধুরী সঞ্চার করার দরকার আছে কিনা। আর কোন 'প্রসাধন'-ই বা এর ওপর চাপানো সম্ভব ! রবীন্দ্রনাথ ঐ রচনাতে বলেছেন, 'কাব্য তা হলে আজ কোন্ লক্ষ্য ধরে কোন্ রাস্তায় বেরোবে। নিজের মনের মতো করে পছন্দ করা, বাছাই করা, সাজাই করা, এ এখন আর চলবে না।' —তা কেন হবে ? বরং নিজের মনের মতো করে বাছাই করা, সাজাই করা, পছন্দ করার সুযোগ বহুগুণ বেড়ে গেছে। আগেই বরং তার নানান অসুবিধে ছিল। আঙ্গিক ও অঙ্গসজ্জার ব্যাপারটা ছিমছাম, ঝরঝরে হওয়াই তো বাঞ্ছনীয়। মায়ার প্রসাধন এখন কবিতার আত্মায় প্রবেশ করাটাই স্বাভাবিক। এভাবে উদ্ধৃতি বাড়িয়ে, আঙ্গিকের মীমাংসায় পৌঁছানো সম্ভব হবেনা কোনো দিন। উদ্ধৃতি আসলে চিন্তার প্রক্ষেপণ। আঙ্গিক নিয়ে কত যে ভাবনার প্রক্ষেপণ আছে। বস্তুত কবি মাত্রেই এ বিষয়ে কোনো না কোনোভাবে ভেবেছেন। আধুনিককালে এ ভাবনা আরো প্রবল

হয়েছে। একদা প্রথাগত ছন্দের কাঠামোতে চেনা কিছু আঙ্গিক ও শব্দালংকার অর্থালংকার নিয়ে ভাবলেই হয়ত সমস্যা মিটে যেত। কিন্তু এখন কবিতার রূপ সৃষ্টিতে ঐ পথ ও প্রকরণ ভিন্ন মোড় নিয়েছে। এতক্ষণ ঐ ভিন্ন মোড় নিয়েই এত বিস্তার করা গেল। তবু সেই একই কথার পুনরাবৃত্তি করে বলতে হচ্ছে, এখন, আঙ্গিক মর্মবস্তু—ও তার যথার্থ প্রকাশের ওপর নির্ভরশীল। এ ক্ষেত্রে ডারউইনের ভাষায় : 'As natural works selection solely by and for the good of each being, all corporal and mental endowments will tend to progress towards perfection'. এবং Species gradually becoming modified. এই Progress towards perfection ও gradually becoming modified-এর কোনো শেষ নেই। কবিতার ক্ষেত্রেও তার আঙ্গিক বা বিন্যাসের ক্ষেত্রে ও ঐ natural selection-কেই মানতে ইচ্ছে হয়। তবু রবীন্দ্রনাথের 'মায়া'র কথা কি মিথ্যে ? যদি মানুষকে একটা সরল রেখা আঁকতে বলা হয় তবে তা সে ডট দিয়ে লম্বা টানে এঁকে দেবে। কিন্তু যদি তাকে বোঝানো হয় যে ঐ সরল রেখা আসলে বহু সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বিন্দুর দ্বারা বহু সূক্ষ্মভাবে গাঁথা একটা সুতো। তা হলে সে বুঝবে না, তার চেয়ে সে বোকা থাকাটাই বেশি পছন্দ করবে। আসলে রবীন্দ্রনাথ যে মায়াহীন, মাধুরীহীন, প্রসাধনশূন্য একটি কবিতার তর্জমা আমাদের দেখিয়েছেন—তার মধ্যেও আছে আধুনিক কালের মায়া, প্রসাধন। আমার অন্তত তাইই মনে হয়েছে। কবিতা তো বরাবরই এই মায়া সৃষ্টিতে ওস্তাদ—প্রাচীন কাল থেকেই। কেবল তার রূপ ভেদ হয়েছে। আঙ্গিক বদলেছে। নইলে গদ্য আবিষ্কারের পর কবিতা থাকার কোনো কথাই নয়। অনেকে এমতে বিশ্বাসও করেন। আসলে, অন্যান্য আর্ট ফর্মের পক্ষে যা সম্ভব নয়—তাইতো কবিতায় সম্ভব। সে ঐ মায়া-ই, অন্যরকম, যুগোপযোগী মায়া—। তার প্রসাধন যে রকমই হোক না কেন।

রবীন্দ্রনাথের 'নিজের মনের মতো করে পছন্দ করা, বাছাই করা, সাজাই করা, এ এখন আর চলবে না'-র পাশাপাশি অন্য আর এক তৃতীয় বিশ্বের নোবেল জয়ী কবি পাব্‌লো নেরুদা বলেন 'আমাদের যুগটাই হল যুদ্ধ, বিপ্লব আর সামাজিক অভ্যুত্থানের। এ যুগে আমাদের সামনে সুযোগ রয়েছে কবিতার নিত্য নতুন দিগন্ত আবিষ্কারের। এর আগে তা ছিল কল্পনার বাইরে। সাধারণ মানুষ আজ কবিতার মুখোমুখি।' এই দুই কবির দ্বন্দ্ব আসলে পুরোনো মায়া-ভঙ্গের ও নতুন মায়া-প্রকল্পের দ্বন্দ্ব ও চিরকাল চলবে, কেননা আমাদের progess তো সর্বদাই towards perfection।

এবার Poetry নামক এক পত্রিকার সম্পাদক-কে ১২ই জানুয়ারী ১৯৫৭-তে লেখা মাও-সে-তুঙ-এর একটা ছোটো চিঠি থেকে কিছুটা উদ্ধৃতি দিই। এই চিঠি on Art and Literature বইটির শেষ দিকে আছে।

Of course, our Poetry should be written mainly in the modern form. We may write some Verse in classical forms as well,

but it would not be advisable to encourage young people to do this, because these forms would restrict their thought and they are difficult to learn. I merely put forwrrd this opinion for your consideration.

Fraternal greetings !

Mao Tse-tung

উক্ত মন্তব্যের ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই। তবু দুটি প্রণিধানযোগ্য কথা এই যে classical form এ লেখা কবিতা যুবকদের চেতনাকে restrict' করতে পারে (২) ঐ ফর্মের কবিতা পড়তেও বেশ অসুবিধেজনক—এটা উনি বান্ত করেছেন। এবং modern form-এই কবিতা লেখা হোক এ কথা পরিষ্কার বলতে চেয়েছেন। এ ছাড়া, কোনো চাপিয়ে দেওয়া মন্তব্য নেই ঐ চিটিতে। ভালো মন্দের জটিল ব্যাখ্যা নেই। তবু তাঁর পক্ষপাতিত্ব স্পষ্ট হয়েছে দুটি অপরিহার্য কারণ দর্শানোর মাধ্যমে।

রুশ বিপ্লবের পর লুনাচারস্কি ও লেনিন তৃতীয় আলেকজান্দারের মূর্তির জায়গায় স্থাপনের উপযুক্ত স্মারক মূর্তির কতকগুলি প্রকল্পের এক প্রদর্শনী দেখতে যান। "সবকটি স্মারকমূর্তিকেই ভ্যাদিমির ইলিচ খুব সমালোচনার চোখে দেখলেন। একটাও তাঁর পছন্দ হল না। ফিউচারিস্ট শৈলীর একটি ভাস্কর্যের সামনে তিনি দাঁড়িয়েছিলেন ভয়ানক অবাক হয়ে, কিন্তু যখন তাঁর মত জিজ্ঞাসা করা হল, বললেন, 'আমি এসব কিছুই বুঝি না, লুনাচারস্কিকে জিজ্ঞেস করুন। যোগ্যমতো মূর্তি আমার একটাও চোখে পড়ছেনা, আমি এই কথা বলতেই উনি খুবই খুশি হয়ে উঠলেন। বললেন 'আর আমি ভাবছিলাম, আপনি বুঝি কোনো ফিউচারিস্ট কিছুকেই স্থাপন করবেন।"—(আ. ভ. লুনাচারস্কি ঃ লেনিন ও শিল্প) কবি মায়াকভস্কি ছিলেন ফিউচারিস্ট। রুশ বিপ্লবের পর অতি উৎসাহী কবি ও সংস্কৃতিকর্মীরা পুরোনো Art form-কে ভাঙার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন। কেননা, "The old art was associated in their minds with the whole hostile class system and regarded as one of its tools of oppression. Hence the masses' aversian to the old art and desire to create their own art which would bear no resemblence whatever to the old"—Prolecult নামক স্বতঃপ্রণোদিতভাবে গড়ে ওঠা নানান বিচ্ছিন্ন দল এসব প্রচার করত। এই অতিবাম বিচ্যুতিকে ঠেকানর জন্যে First All-Russia Prolecult Conference-এ লুনাচারস্কি এক বলিষ্ঠ ভূমিকা নিয়ে বলেন 'The independence of proletarian art does not consist in artificial originality but presuposses an aquaintance with all the fruits of the preceeding culture'. এ প্রসঙ্গে মন্তব্য নিষ্প্রোয়োজন। লেনিনও মজা করে বলতেন, বুর্জোয়ারা যন্ত্র বা ইঞ্জিন আবিষ্কার করেছেন বলে কি আমরা তা ব্যবহার করব না ? আমরা তা আমাদের

কাজে লাগাবো। তাকে আরো বেশি উন্নত করব যা আমাদের কাজের পক্ষে আরো বেশি উপযুক্ত হবে। 'ফর্ম' সম্বন্ধে—এই দ্বান্দ্বিক দৃষ্টিভঙ্গি লেনিনের ছিল। কার্ল মার্কসের স্মৃতি-স্তম্ভ নিয়ে একটি ঘটনার উল্লেখ করা যেতে পারে এখানে। 'ম' (পুরো নাম লুনাচারস্কি বলেন নি) একজন প্রখ্যাত ভাস্কর। কার্ল মার্কসের মূর্তি তিনি গড়বেন বলে উঠে পড়ে লাগলেন। মহান কার্ল মার্কস—অতএব, চার বিশাল হাতির ওপর মার্কস দাঁড়িয়ে আছেন—এরকম মূর্তির পরিকল্পনা তিনি করলেন। এটা লেনিনের ভালো লাগল না। তিনি ঐ ভাস্করের খ্যাতির কাছে নত না হয়ে ঐ পরিকল্পনা বতিল করে দিলেন। এবং তাঁর ভালো লেগেছিল আলিওশিনের নেতৃত্বাধীন একটি যৌথ-প্রকল্পে। পরিকল্পিত প্রত্যাশিত দ্যোতনা-ময় মূর্তিটিকেই তিনি অনুমোদন করলেন। খুবই অপ্রত্যাশিত দ্যোতনা যে শিল্পকে সুন্দর করে না—fantasy হয়ে যায়—এটাই হয়ত আমরা এখান থেকে শিখতে পারি।

প্রত্যাশিত দ্যোতনাই কি শিল্পে 'মায়া' নয় ? প্রত্যাশিত দ্যোতনাময় আঙ্গিকই সেরা আঙ্গিক। অর্থাৎ 'Modern' হওয়ার ঝোঁক অতি বাম আকার ধারণ করলে তা 'functionalism' হয়ে পড়ে, বা উদ্ভট হয়ে পড়ে। Futurist মুভমেণ্ট লেনিনের চোখে হয়ে পড়েছিল 'কিম্ভূত' ফর্ম সর্বস্ব ব্যাপার। এক রাতে ক্লাকফুস প্রকাশনীর প্রকাশিত বিশ্বের সেরা শিল্প-সংগ্রহশালায় তাঁকে রাত কাটাতে হয়েছিল। সে রাতে তাঁর ঘুম হয় নি। শুধু অ্যালবাম দেখে রাত কেটে গেছে। পরে তাঁর সবিনয় মন্তব্য 'শিল্প-ইতিহাস কী অপূর্ব ক্ষেত্র।...কাল সকাল পর্যন্ত ঘুমুতে পারিনি, একটার পর একটা বই দেখে গেছি। ভেবে মন খারাপ হয়ে গেল যে, শিল্প চর্চার সময় আমার হয় নি, হবেও না'। 'ফিউচারিস্ট' 'প্রলেতকুল্‌তে' প্রভৃতি শিল্প-সাহিত্য আন্দোলনে, লুনাচারস্কির কিছুটা প্রশ্রয় থাকলেও লেলিনের খুব ছিল না। মায়াকভস্কির 'পনের কোটি' নামধেয় কবিতাটি ওঁর ভালো লাগে নি। ওঁর কাছে বইটা কৃত্রিম বলে মনে হয়েছিল। খুবই মজার কথা হল 'লেনিনের মত ছিল আমাদের সর্বাগ্রে যত্ন নিতে হবে যাতে মিউজিয়ামগুলো ভেঙে না পড়ে, যাতে বিপুল সম্পদ রক্ষিত আছে, বড় বড় বিশেষজ্ঞরা যাতে অনশনে না ভোগে ও দেশান্তরে না পালায়। তাঁর মতে, পরীক্ষাব্যাকুল তরুণদের সর্বাগ্রে স্থান দেবার ব্যাপারে আমরা যদি একটু অপেক্ষা করি, তাতে অত পাপ হবে না।' (সংস্কৃতি ও সাংস্কৃতিক বিপ্লব ॥ লেনিন ॥ পৃঃ ১৮৭-৮৮)

এসব নানা মতামত থেকে একটি সিদ্ধান্তে আসা যায় যে 'form' নিয়ে পরীক্ষা-পাগল হয়ে ওঠার খুব বোশ দরকার নেই। তাতে কৃত্রিমতার ঝোঁক চলে আসবে। 'formalism' শিল্পের এক ক্ষতিকারক শত্রু। Formist হয়ে পড়া মানে শিল্পের সর্তকেই ধ্বংস করে দেওয়া। কৃত্রিমতা শিল্প নয়। আঙ্গিকের চাপে বিষয়ের দ্যোতনাকে ধ্বংস করা এক নিন্দনীয় অপরাধ। আজকাল খুব সাধারণ মানুষও শিল্পের সমজদার হতে পারে। এমন কি শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন সভায় বক্তৃতার চেয়ে পাবলো নেরুদার একটা পুরো বই-এর কবিতা শ্রমিকদের বেশি ভালো

লেগেছিল, এটা পাব্‌লো নেরুদার অভিজ্ঞতা থেকে আমরা জানতে পেরেছি। মাও-সে তুঙ আভাসে Modern formকে প্রয়োজনীয় বলে আহ্বান জানালেন, তার মানে এই নয় যে তা 'form' সর্বস্ব হয়ে উঠবে। লেনিন টলস্টয়, পুশ্‌কিন, দস্তায়েভ্‌স্কির রচনাকে খুবই পছন্দ করতেন, তার মানে এই নয়যে তিনি আধুনিক রুচির মানুষ ছিলেন না। তার অভিযোগ ছিল 'ফিউচারিস্ট', 'প্রলেত্‌কুল্‌তে'-এর মধ্যে লুকিয়ে থাকা কৃত্রিমতার প্রতি। এই কৃত্রিমতাই হয়ত একরকম অতিবাম বিচ্যুতি। অপ্রত্যাশিত দ্যোতনা, অপ্রত্যাশিত form অভিনবত্ব বলে চালানো যেতে পারে, কিন্তু, সত্যিই যা অপ্রত্যাশিত, তাতে তীব্র 'শক্' থাকলেও তা শেষ পর্যন্ত ওপর-চালাকী হয়ে ওঠে। হয়ত লেনিন—এই ওপর-চালাকীর চেয়ে, টলস্টয় দস্তয়েভ্‌স্কির ভিতরের সৌন্দর্য অনেক বেশি পছন্দ করতেন। আমরাও তাই করে থাকি, সম্ভবত। তাছাড়া আমরা লক্ষ করেছি প্রথম শ্রেণীর কবিতাগুলি আঙ্গিকের জোরে টিকে থাকে নি। থেকেছে ভিতরের সৌন্দর্যের জন্যে। বৈষ্ণব পদাবলীর বহু কবিতা আজও আধুনিক। অনুজ প্রতিম কবিবন্ধু সঞ্জীব প্রামাণিকের সঙ্গে আমার ঘরে বসে একদিন দীর্ঘ কথা হয়েছিল এ বিষয়ে। যার সারার্থ, সঞ্জীব বললেন—আল মামুদের কবিতায়ও বৈষ্ণব পদাবলীর এক ছুঁইয়ে আসা প্রভাব সুন্দরভাবে কাজ করেছে। অর্থাৎ সে আধুনিক কালের কবিকেও প্রভাবিত করে। মনে করুন সেই 'বরিষার ছল পিয়া দরিয়ার না'—আল মামুদের একটি কবিতায় ধ্বনিত হয়েছে। ঐ সব বৈষ্ণব কবিতা বিন্দুমাত্র প্রাচীন হয়ে যায় নি আজও, যদিও তার প্রচুর নিয়ন্ত্রণ ছিল, ছিল এক প্রকট comitmemt এর চাপ। কিন্তু, বলা যায় এই কমিটমেন্ট আন্তরিক ছিল বলেই—ঐ অপূর্ব লিরিকগুলি বাংলা কবিতা পেয়েছে। ঐ লিরিক কি অনুবাদ করা সম্ভব? সঞ্জীবের মত, যদি সম্ভব হয়, তো তা বিশ্ব সাহিত্যের কদর কুড়োবে। ও তো আধুনিক বাংলা ভাষায় এর অনুবাদের কথাও বলল। কেন ঐ কবিতার প্রতি আমাদের এত ভালোবাসা? কেননা, কি আঙ্গিক, কি বিষয়-দ্যোতনায়, তা আজও সজীব!

আঙ্গিক সম্বন্ধে এত কথা বলেও প্রায় কিছুই বলা হলনা। সবচেয়ে যা বলার কথা তা হল, ক্ল্যাসিকাল আঙ্গিকের কিছু পণ্ডিতী, কিছু প্রথাগত দিক্ নির্দেশ আমরা পেয়েছি। এর সবচেয়ে সহজপ্রাপ্য বইটি T. S. Dorsen সম্পাদিত Classical Literary Criticism। যেখানে Aristotle, Horace ও Longinus-এর সাহিত্যতত্ত্ব ধরা আছে। আমাদের স্বদেশে আছে অভিনব গুপ্ত আনন্দ বর্দ্ধনের ধ্বন্যালোক-লোচন—এ সব থেকে classical form সম্বন্ধে কৌতূহলী পাঠকমাত্রেই অনেক কিছু জানতে বুঝতে পারবেন। কিন্তু আধুনিক শিল্প আঙ্গিকের ওপর ঠিক এরকম কোনো গোছানো বই নেই। হয়ত আছে, কিন্তু তা যথেষ্ট নয়। কেননা, Modern form সম্বন্ধে চূড়ান্ত এক নির্দেশ করে দেওয়া সম্ভব নয়। ক্রমশ তা Perfection-এর দিকে যাচ্ছে এবং কবে যে Perfection এ পৌঁছুবে তা আমার জানা নেই। আধুনিক আঙ্গিক-প্রকরণের ওপর হয়ত ভালো ভালো বই আছে, আমি তা পড়িনি। এই না পড়ার কারণ হেতু—এ রচনায় form

বিষয়ে খুব পরিষ্কার মতামত আমিও ব্যক্ত করতে পারলাম না। প্রসঙ্গত দু'টি বই—যা আমি পড়েছি—উল্লেখ করছি। (১) ক্রিস্টোফার কডওয়েল রচিত ইলিউশন এণ্ড রিয়েলিটি এবং আর্নস্ট ফিশার রচিত দি নেসেসিটি অব আর্ট নামক বই দুটি। এতে form-এর ওপর আলোচনা আছে। আধুনিক শিল্প আন্দোলনগুলির ইতিহাস ও ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আঙ্গিকের কথা এসেছে। দি নেসেসিটি অব আর্টে আঙ্গিকের ওপর এক বিশাল আলোচনাও আছে। কিন্তু এসব গবেষণা গ্রন্থ। সংবাদ ও তার ব্যাখ্যার আকারে সাজানো। এতেই মন ভরার কথা নয়। দরকার খুবই মৌলিক ও আন্তরিক কথা। যার কিছুটা আভাস আমি সৃজনশীল মানুষের কথা থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে দিতে চেয়েছি। ক্ল্যাসিকাল form নিয়ে আলোচনা করা বাতুলতা। কেননা, তার নড়ন-চড়ন হবার নয়। Classical literary criticism ও ধ্বন্যালোক লোচনই যথেষ্ট। পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও এরকম বই আছে নিশ্চয়। কেননা, ক্ল্যাসিকগুলি এক এক দেশের এক এক জাতীয় চরিত্রের দ্যোতক। আধুনিক form-ও একইভাবে সারা বিশ্বেরই form। আঙ্গিক খুব দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে, আজকাল। এবং এক একটি আন্দোলন এক একটি যুৎসই form এর জন্ম দিয়ে কুড়ি / বাইশ বছরেই ফুরিয়ে যায়। কিন্তু, এই টুকরো টুকরো নানা আন্দোলনের সাহায্যে পুরোনো আঙ্গিক ক্রমশঃ বাতিল হয়ে নতুন আঙ্গিকের একটা ভিত্তি ইতিমধ্যেই তৈরী হয়ে গেছে, এটাও আমরা আন্দাজ করতে পারি। এই নানারকম আবর্তন বিবর্তনের মধ্যে দিয়েই form এগুবে—এটা ধরে নেওয়াই ভালো। আসল ব্যাপার হল দ্যোতনা, ফর্মের চাপে অন্তর্নিহিত কাব্য দ্যোতনা চাপা না পড়লেই হল। বরং ফর্ম সেই দ্যোতনাকে টেনে বের করে আনুক।

এখনও, দুই বিখ্যাত শিল্পী, ভ্যান গখ ও পিকাশোর জীবনী থেকে পাওয়া দু'টি ঘটনার কথা বলার লোভ সামলাতে পারছি না। ভ্যান গখের জীবনী পড়তে গিয়ে এক জায়গায় লক্ষ করেছিলাম, ভ্যান গখ কয়লা খনিতে কর্মরত কিছু শ্রমিকের চিত্র আঁকলেন। আপাত চোখে দেখা গেল যে ঐ কর্মরত অবস্থার দেহকাণ্ডের হাত দুটির একটি ছোটো লাগছে। কিন্তু আসলে সে হাত ছোটো নয়। এরকম আরো নানা চিত্রে নানা রূপ তথাকথিত 'বিকৃতি' দেখা গেল যা চিরাচরিত প্রথা বিরোধী। পরে, বহু পরে, যখন তিনি প্যারী শহরে নতুন শিল্প চেতনায় উদ্বুদ্ধ তরুণ শিল্পী-দের মধ্যে এলেন, এক হতাশ শিল্পী হিসেবে (তাঁর কোনো প্রথাগত শিল্প-শিক্ষা ছিল না) তখন বোঝা গেল, যে ঐ তথাকথিত 'বিকৃত' চেহারাগুলিই আসল চেহারা। কর্মরত অবস্থার গতিকে ও স্পন্দনকে যথাযথভাবে ধরতে গেলে classical রীতির মূর্তি হবে না। কেননা, ক্ল্যাসিক্যাল মূর্তির অঙ্গ-ভঙ্গিমা ছকে দেওয়া থাকে। ভ্যান গখের মূর্তি ছকে দেওয়া মূর্তি নয়।

পিকাশো খুব ঘন ঘন তাঁর আঙ্গিক বদলাতেন। এ প্রসঙ্গে তিনি নিজেই বলে-ছিলেন, আঙ্গিক নিয়ে তিনি বিন্দুমাত্র ভাবেন না। তাঁর আঙ্গিক নিয়ে তাঁর সমা-লোচকরা যতই ভাবুক না কেন, তিনি শুধু চান তাঁর বিষয় আর ভাবনাচিন্তাকে

সফলতার সঙ্গে রূপ দিতে। তাতে যে আঙ্গিক গড়ে ওঠে উঠুক। এত যে ঘন ঘন আঙ্গিকের পরিবর্তন, কিন্তু তাঁর প্রতিটি আঙ্গিকই সফল হয়েছিল তাঁর চিত্রের বিষয় গৌরবে। এবং আঙ্গিক ও বিষয়ের সমন্বয়ে পিকাশো আজ কিংবদন্তির শিল্পী। উক্ত দুটি বিবরণ থেকে আমরা বুঝলাম যে, বিষয়ই তার আঙ্গিক স্থির করে নেয় নিজ থেকেই।

বার্নার্ড শ' তার Back to Methuselah-র ভূমিকাতে ১৯২১ সালে লিখেছিলেন Meanwhile the name of Tragedy was assumed by Plays in which everyone was killed in the last act, just as, inspite of Molier, plays in which everyone was married in the last act called themselves comedies. Now neither tragedies nor Comedies can be produced according to a prescription which gives only the last moments of the last act.—কেন এরকম, এতটাই অন্য রকম হল tragedy বা comedy? Tragedy বা Comedy-র প্রথাগত ঐ Prescription আর চলে না কেন? নতুন জীবনবোধ, সমাজবোধ গড়ে ওঠার ফলে। এটা শ' বেশ বুঝেছিলেন বলেই তো আমরা জানি। আর তাই তাঁর tragedy গুলি প্রথাসিদ্ধ tragedy নয়, কমেডিও প্রথাবদ্ধ নয়। এমনকি তিনি প্রথাবদ্ধ অভিনয় পদ্ধতিকে, দর্শক ও ম্যানেজারদের প্রথার প্রতি তীব্র আকর্ষণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে tragedy র কান্না ও কমেডির হাসির 'ম্যানারিজম্' উপড়ে ফেলেছিলেন। আমাদের দেশের ত্রিশ/চল্লিশ দশকের সেরা অভিনেতাদের মতো ওদেশের সেরা অভিনেতারাও 'ম্যানারিজম্' দিয়েই দর্শকদের মনজয় করতেন। দর্শকরাও ঐ বিশেষ অভিনয় কৌশলকেই অভিনয়-শিল্প বলে মনে করত। বার্নার্ডশ' একে ভেঙেছিলেন প্রবল প্রচেষ্টায়। Plays Pleasant-এর ভূমিকায় তিনি একজায়গায় বলেছেন 'The misunderstanding is complicated by the fact that actors, in their demonstration of emotion, have made a second nature of stage custom, which is often very much out of date as a representation of contemporary life. Sometimes the stage custom is not only obsolete, but fundamentally wrong'—অভিনয়ের হাসি-কান্নাগুলির রীতি যে শুধুমাত্র সেকেলেই ছিল তাই নয়, সেগুলো ভুলভালও ছিল, যা সমসাময়িক জীবনের পক্ষে উপযুক্ত নয়। কাজেই, পরিবর্তনশীল রুচির সঙ্গে, সমাজে নতুন নতুন ঘটনা জন্মাবার সঙ্গে সঙ্গে শিল্পের আঙ্গিকেরও রূপান্তর স্বাভাবিকভাবেই এঁরা মেনে নিয়েছেন। The Will of the Gods-এ তিনি লিখেছেন, ক্লাসিক্যাল দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে 'The way of soldier is the way of death; but the way of the gods is the way of life, and so it comes that a god at the end of his way is wise and a soldier at the end of his way is a fool. —এই ক্লাসিক্যাল নৈতিকতার বিরুদ্ধে তাঁর 'Arms and the

Man' নাটকের নায়ক ব্লুনৎস্‌লি ঐশী wisdom-কে নস্যাৎ করছে। —এ এক আশ্চর্য কমেডি, যে কমেডির জন্যে আমাদের শেষ অংকের শেষ দৃশ্যে একটি সুখী বিবাহের জন্যে অপেক্ষা করতে হয় না। এ নাটকের সংলাপ পর্যন্ত প্রথাবদ্ধ নাটকের থেকে স্বতন্ত্র হতে বাধ্য। আধুনিক রুচি ও জীবনবোধ এভাবেই প্রাচীনতাকে বিষয় ও আঙ্গিকে অতিক্রম করে এগিয়ে চলে। এখন আর ক্লাসিক্যাল ট্রাজেডি বা কমেডি লেখার যুগ নেই।

মডেল একটু বদলে দিলে যদি উড়োজাহাজ আর একটু বেশি দ্রুতগামী হয়, তো মানুষ তাই-ই করবে। রোমান স্থাপত্যের বদলে আমেরিকান স্থাপত্য বর্তমান যুগে বেশি কার্যকর। তাই সুরম্য প্রাসাদের পরিবর্তে স্কাই-স্ক্র্যাপার গড়ে উঠবে। গঠন-শৈলীর এই পরিবর্তন হয়েছে প্রয়োজন নামক 'বিষয়'-এর স্বার্থেই। নান্দনিক দৃষ্টিভঙ্গিও এভাবেই বদলে যায়। গ্রিকো-রোমান স্থাপত্যের খড়খড়ি তার আঙ্গিকের সঙ্গে ছিল matching, এখন আমেরিকান স্থাপত্যের সঙ্গে—গ্রিল, কোলাপ্‌সিবিল—কম সুন্দর লাগেনা। অলংকরণ—যাকে রবীন্দ্রনাথ 'প্রসাধন' বলেছেন, তারও এভাবেই রূপান্তর হয়। তাছাড়া রবীন্দ্রনাই তো বলেছেন যে নারী আপনা থেকেই সুন্দরী, তার অলংকার লাগে না। এই আপনা থেকে সুন্দরী হওয়ার ব্যাপারটা আসলে মৌল উপাদান বা মর্মবস্তুর ব্যাপার। সে নিজে থেকেই এক অপরিহার্য ও তার প্রকাশের পক্ষে সফল আঙ্গিক গড়ে নেয়, যা সহজাত সুন্দর যা সহজ সুন্দর। এছাড়া আঙ্গিকের আর কোনো মানে নেই।

Walter Pater তাঁর Style নামক বিখ্যাত প্রবন্ধটিতে personality-কেই style বলেছেন। আগে এক জায়গায় আমি বলেছি form বা আঙ্গিকও একটা personality, আর সেই অর্থে style-ও। আমি এ ব্যাপারে দু'যুগের দুই কবির নাম করব উদাহরণ স্বরূপ। Walt Whitman ও Vasco Popa। এঁদের কবিতার আঙ্গিক ব্যক্তিত্ব-প্রধান আঙ্গিক। এতই ব্যক্তিত্ব-প্রধান যে তাঁদের নিজস্ব আঙ্গিক ছাড়া আর কিছু মনে হয় না। এমন কি এ আঙ্গিক দ্বিতীয় ব্যক্তিত্বের ক্ষেত্রে মানাবে না। এঁদের আঙ্গিক থেকে যথেষ্টই লাভবান হওয়ার সুযোগ আছে ঠিকই, তবু ওঁদের কবিতার রূপগত দিকটা যা আঙ্গিকে জড়িয়ে আছে তা একান্তই ওঁদের। তার মানে একান্তই ব্যক্তিত্বপ্রধান আঙ্গিক। তার মানে personality is the style-ই শুধু নয় personality is the form and style-ও বটে। প্রচুর উদাহরণ দিয়ে এটা বোঝানো যায়। সে আমার ব্যাপার নয়। আমি শুধু বলতে চাই যে, আধুনিক কালের একজন সফল কবির কাছ থেকে আমরা একটা নতুন ও স্বাভাবিক আঙ্গিকও পেয়ে যাই। এভাবে প্রতিটি সফল কবির কাছ থেকে সর্বদাই এক একটি নতুন আঙ্গিক পেয়ে পেয়ে আমরা একদিন প্রথাসিদ্ধ আঙ্গিককে সাহিত্যের ইতিহাসেই পাঠিয়ে দেব হয়ত বা। এসব আঙ্গিক গদ্য ও পদ্যের ভিতর থেকে প্রতিটি ক্ষেত্রেই নতুন মাত্রা নিয়ে বেরিয়ে আসবে—লিরিকে এক একটি নতুন 'ডাইমেনশন'। কিন্তু এরও অভ্যন্তরে থাকবে বিষয় বা বিষয়-গৌরব। surrealist দের আঙ্গিক বেশ লক্ষণীয়। 'বিশুদ্ধ মানসিক স্বয়ংক্রিয়তা' অবচেতনার

চলচ্চিত্রের মতো কবিতার শরীরে ফুটে উঠেছে। অবচেতনা ব্যাপারটা নতুন কিছু নয়। 'ক্লাসিক' গ্রীক ট্রাজেডির সুদৃঢ় আঙ্গিকের মধ্যেও তার আশ্চর্য কাজ আছে। যে কোনো ভালো কবিতা, ভালো নাটকে বার বার আমরা 'অবচেতনা'র সূক্ষ্ম কাজ দেখেছি। কিন্তু Surrealist-দের লক্ষণীয় ব্যাপারটা হল—এই অবচেতনা কবিতার আঙ্গিকও গড়ে তুলল। হার্বার্ট রীড একজন লণ্ডনের Surrealist। তিনি বলেছেন 'In dialectical terms we claim that their is a continual state of opposition and interaction between the world of objective facts—the sensational and social world of active and economic existance—and the world of subjective fantasy. This opposition creates a state of disquititude, a lack of spiritual equilibrium, which it is the business of the artist to resolve." Objective facts ও subjective fantasy—এই দুয়ের সংঘাতে যে spiritual equilibrium নষ্ট হচ্ছে তাকে প্রকাশ করাই artistদের কাজ। কাজেই—এই মনোভাবের প্রতিক্রিয়ায় গড়ে ওঠা কবিতার 'মর্মবস্তু' কোনো প্রথাবদ্ধ আঙ্গিকে প্রকাশিত হতেও পারে না। আমরা এক নতুন আঙ্গিকও পেয়ে যাই। এভাবে দেখলে, প্রতিটি আন্দোলন থেকেই এক একটা নতুন আঙ্গিক আমরা পেয়েছি। আন্দোলন থেকে ওঠে আসা আঙ্গিকগুলিকে যৌথপ্রচেষ্টার আঙ্গিক হিসেবে নেওয়া যেতে পারে, যদিও কবিব্যক্তিত্বের গুণে, তার রকমভেদও আছে। সেই একই কথা এসে যায়—Personality is the form and style। যেমন স্যুরবিয়ালিস্ত কবিদের মধ্যে নানান রূপভেদ দেখা যায়। টানা গদ্য থেকে symbolic কাঠামোতে পর্যন্ত এঁদের আঙ্গিক সজ্জিত হয়েছে, যদিও প্রথাবদ্ধ কাব্য কাঠামোর বিন্দুমাত্র নেই। সব মিলিয়ে, শেষ পর্যন্ত, ঐ 'আঙ্গিক' স্যুররিয়া-লিস্তদের আঙ্গিক বলে চেনা যায়। স্যুররিয়ালিস্তদের 'অঙ্গ বৈচিত্র্য' কবির ব্যক্তিত্ব অনুসারে রকম ভেদ হলেও, classicist ও humanist—উভয়ের দ্বারাই নিন্দিত surrealist দের ঐ 'irrational character'-ই ঐ কাব্য আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য —এবং ওদের কবিতার কাঠামো বা আঙ্গিকের বৈশিষ্ট্য। তাঁদের 'relationship between poetry and dreaming'—এক নতুন 'মর্মবস্তু'র সন্ধান দিয়েছিল। তাঁরা তো স্বীকারই করেছিলেন 'mental personality is originally determined by a failure of social adoptions. —Edward B, Germain সম্পাদক হিসেবে 'surrealist poet' নামক কাব্যগ্রন্থটির ভূমিকাতে যে দু'টি বৈশিষ্ট্যের কথা বলেছেন—এই কবিদের প্রসঙ্গে—তা এখানে তুলে ভার বাড়িয়ে লাভ নেই। উৎসাহী পাঠক সে সব জানেন, দেখেছেন। আমি শুধু বলব—ঐ বৈশিষ্ট্যগুলির প্রতিটির প্রক্রিয়ায় surrealist দের কাব্য-কাঠামো বা আঙ্গিক গড়ে উঠেছে। 'আঙ্গিক' সম্বন্ধেও যে আমাদের এক অবচেতনা কাজ করে, surrealist কবিরা তাকেও যেন মুক্তি দিলেন। তার মানে, কবি ব্যক্তিত্ব, আন্দো-লনগুলির ভিতরকার ব্যক্তিত্ব—সব মিলিয়ে কবিতার নতুন নতুন আঙ্গিক আমরা

পেয়েছি, এরকম মনে করার সঙ্গত কারণ আছে, আর এ কারণেই Modern Form'-এর জন্যে কোনো শাস্ত্র গড়ে তোলা সম্ভব নয়। এই Modern form একটা দ্বান্দ্বিক ইতিহাসের মধ্যে প্রবেশ করেছে। প্রথাবদ্ধ 'form'গুলিও এর মধ্যে চলে আসতে বাধ্য-এবং তা থেকেও নতুন ঘ্যানো পাওয়া সম্ভব। কিন্তু, প্রথাবদ্ধ কোনো আঙ্গিক নেই বলে তাকে কবিতা বলা যাবে না—এরকমচিন্তা মূর্খতাই হবে।

আবার একথাও ভালো করে ভেবে দেখা দরকার 'প্রথাবদ্ধতার' সঙ্গে 'প্রথা বিরোধিতার' সামান্যই পার্থক্য। ইতিহাসের দিক থেকে। প্রথা বিরোধিতা কোনো শূন্যতা নয়। যদি শূন্যতার দিকে যায় তো তবুও না। কেননা, একটা প্রথা ভাঙার জন্যে যে 'প্রথা বিরোধিতা' তা যে মুহূর্তে স্বীকৃতি বা প্রতিষ্ঠা পায়, তখনই তা প্রথা। এবং সেই প্রথারও বিরোধিতার প্রশ্ন এসে যায়। এভাবে ইতিহাসের নিয়মে তা দ্বান্দ্বিক হয়ে ওঠে। যে দেশের কাব্য আন্দোলনে, বা কাব্যচর্চায় এই দ্বান্দ্বিকতা থাকে, সে দেশ লাভবান হয়। কিন্তু এই 'প্রথা বিরোধী' হওয়ার ব্যাপারটা সহজও নয়। যদি নতুন কোনো জীবন-জিজ্ঞাসা, বোধ এর পিছনে কাজ না করে, তা হলে, প্রথা বিরোধিতার নামে যা দাঁড়ায় তা গ্রহণযোগ্য হয় না, বলাই বাহুল্য। শুধু 'আঙ্গিকে' প্রথা বিরোধিতা বস্তুত আঙ্গিকসর্বস্বতা হয়ে যায়। আবার ব্যক্তিগতভাবে কেউ কোনো আঙ্গিকে কয়েকটি কবিতায় সিদ্ধিলাভ করলে, ঐ আঙ্গিক পরে তাকে কৃত্রিমভাবে গ্রাস করতে পারে। এবং তখন তাকে আঙ্গিকসর্বস্ব মনে হতে পারে। আর এই আঙ্গিকের যন্ত্রচালিত কবিতা আমরা বেশি সহ্য করতে পারি না। তার অর্থ কবি হিসেবে জীবন কাটাতে হলে, নিজের তৈরী 'আঙ্গিক'-নিজেকে কিছুটা ভাঙতে হয়ই। বিষয়েরও পট-পরিবর্তন দরকার হয়। যদিও, personality বা ব্যক্তিত্ব জিনিষটা টিকিয়ে রেখেই। এই স্ববিরোধিতার মধ্যে যদি personality-টাও এলোমেলো হয়ে যায়, তা হলে কবিকে চেনাই মুশকিল হবে। আসলে personality-টাই সব। সেটাই বিষয়, সেটাই রীতি। এই personality—এক জটিল ব্যাপার বলে আমার মনে হয়। সংসারের নানা বস্তুগত ও ভাবগত সংঘাতে গড়ে ওঠা এক গভীর personality—যার মধ্যে, সমসাময়িকতা ছুঁয়ে এক বহ-মানতা থাকে। ঐতিহ্য ও ভবিষ্যৎ সাময়িক ব্যক্তিত্বে এসে মিলিত হবে। বড় মাপের ব্যক্তিত্বের মধ্যেই ঐ 'নৈরাত্মিক' আত্মিকরণ থাকে বলে আমার ধারণা। এ ব্যক্তিত্ব, যা নিজেই একটা 'form'—হয়ে উঠতে পারে—যেমন, ধরা যাক বার্ণার্ড শ' বা রবীন্দ্রনাথ। এরকম ব্যক্তিত্ব যাই লিখুক, তার একটা 'আঙ্গিক' গড়ে ওঠেই। 'আঙ্গিক' 'আঙ্গিক' করে তাকে কিছুই হাতড়ে বেড়াতে হয় না। রবীন্দ্রনাথের 'রক্তকরবী' এর একটা উদাহরণ। তিনি তো কবি, কিন্তু বাংলায় তিনিই আজ পর্যন্ত সেরা literary নাট্যকার। একসময় এক নাট্য সংস্থার সঙ্গে যুক্ত থেকে, নাটক নিয়ে ভাবনা চিন্তার সময় এ ব্যাপারে আমি নিশ্চিত হয়েছি, পণ্ডিতদের কথা শুনে এ কথা বলছি না। তার মানে, form is the personality, personality is the form—এ কথাও আমরা বলতে পারি।

আঙ্গিক সম্বন্ধে খোলা কথা বলার প্রসঙ্গে আরো বহু কথা বলার থেকেই যায়। আমি আবার একটা কথার পুনরাবৃত্তি করব এখানে, তা হল, কী বলব সেটা স্পষ্ট হলে কী ভাবে বলব এটা কোনো বাধা হয় না। একটা বড় form-এর বাহিরের কাছে, কবিতার এটাই প্রধান। এখন, সত্যিই আর কেউ বলবে না যে 'তুমি পয়ার লেখনি তাই কবিতা লেখনি'। খুব সাধারণ পাঠকও, দেখেছি, এ ব্যাপারে এতদিনে উদার হয়েছেন। আমার এক কনিষ্ঠ বন্ধু, সিদ্ধার্থ ভট্টাচার্য বাঁকুড়ার এক কলেজের অধ্যাপক। বাঁকুড়াতে তার বাড়িতে দু'রাত খুব জমিয়েছি। সে পলিটিক্যাল সায়েন্স পড়ায়। নানা কথার ফাঁকে সে কবিতা সম্বন্ধেও দু'চারটি মন্তব্য করেছিল (ও কবি নয়, কবিতার নিয়মিত পাঠকও নয়, আমি ওখানে কবিতার বিষয়ে কোনো কথাও তুলিনি)—যার সারার্থ হল যে, সে ছড়াকে ছন্দের, প্রধানত আজকের নানা কাজ ভালোবাসে। তাঁর মতে পদ্য যদি থাকে তো 'ছড়া'-তেই থাকবে।—হাঁ, সে কবিতা পড়ে, কবিতার কাছে তার চাওয়ার অন্য জিনিস আছে, ছন্দ নয়, অলংকার নয়, আঙ্গিকও নয় কেবল 'ভাব'। 'ভাব' তার মতে জীবনের অনুষঙ্গ। এবং তার মতে, আমাদের আজকের কবিতায় আর সবই আছে, কেবল ভাবের বড় দীনতা।—শিক্ষিত বুদ্ধির এক স্বাভাবিক সংশয়ী মানুষ। সেও দেখছি 'ভাব'-কেই প্রাধান্য দিতে চায়। এরকম সাধারণ পাঠকের মধ্যে কবিতাকে ফেলে যাচাই করা যেতে পারে। কবিতায় বলতে আমার কাছেও আঙ্গিকের চেয়ে বলার কথাটা বেশি জরুরী।

এ মন্তব্যটা তো জোকারের মতো শোনালো। আর যদি হয়, তা হলে তো দেয়াল লিখন সব চেয়ে ভালো কবিতা। হাঁ, দেওয়াল-লিখনের পদ্ধতিও যে ব্যবহৃত হয়নি, তা নয়, তাও হয়েছে, আঙ্গিক ও বক্তব্যের সমন্বয় সাধনের জন্যে। এ ব্যাপারে সুন্দর একটা প্রবন্ধ পড়েছিলাম আজ থেকে প্রায় পনের বছর আগের এক্ষণের একটি সংখ্যায়। এক্ষণের ঐ সংখ্যা হাতের কাছে থাকলে কাজে লাগানো যেতো। ক্ষমা করবেন।

ইতিমধ্যে আর একটা ব্যাপার মনে পড়ল। 'Anti Poetry'। ব্যাপারটা আমিও ভালো বুঝিনা। লাতিন-আমেরিকা—আফ্রিকার কবিতা অনুবাদের মাধ্যমে সামান্য কিছু পড়েছি। তাঁরা তৃতীয় বিশ্ব (?)-এর কবিতার ব্যাপারে নতুন কিছু ভাবছেন বলে মনে হয়। পাবলো নেরুদা-ই নাকি Anti Poerty-র উদগাতা। (তাঁর Surrealism-এর আমেজ ছিল—যেমন Nothing but Death, Ode to the water melon) আফ্রিকান কবিতার কাঠামো দেখলে মনে হয় ওতে বেশি আবেগ ধরে, একটু বাঁকালো, একটু বেশি মাত্রায় দেশাত্মবোধের উত্তেজনা ধরতে পারে, এমন আঙ্গিক। African writing today নামক বইটির কথা স্মরণ করেই বলছি। কিন্তু 'Anti-Poetry' কেন? কারণ আর কিছুই না, প্রথাসিদ্ধ কবিতার কাঠামো, ভাষা এসব নাকি বুর্জোয়াদের দ্বারা লালিত, ধর্ষিত হয়ে বাসি আর খেলো হয়ে গেছে। তাই Anti Poetry। কিন্তু Anti শব্দটি কেন? শব্দটির মধ্যে অভিধায় বিভ্রান্তির গন্ধ থেকে যায়। কবিতা

কবিতাই, তার বিরুদ্ধে যে কবিতা, তাও কবিতাই। কিন্তু প্রশ্ন, সত্যি সত্যিই, তৃতীয় বিশ্ব নিয়ে থেকেই যায়। যদিও তৃতীয় বিশ্ব, আসলে দ্বিতীয় বিশ্বের সামিল। একটা আছে শাসক-শোষকের বিশ্ব আর একটা আছে শোষিতের বিশ্ব। তৃতীয় বিশ্ব ঐ দ্বিতীয় বিশ্বের মধ্যেই পড়ে যায়। কেননা, আনুষ্ঠানিকভাবে সাম্রাজ্যবাদ মুক্ত হয়েও তা কতটা স্বাধীন থাকা সম্ভব—এটা সমাজ বিজ্ঞানীরা আমার চেয়ে ঢের ভালো জানেন। আমার মনে হয়, তৃতীয় বিশ্বের জনগণ দ্বিতীয় বিশ্বেরই মানুষ। তবু, এই সাম্রাজ্যবাদ থেকে মুক্ত হওয়া দেশগুলির আবার আছে এক নিজস্ব 'form'। তারা Developing। এই Developing শব্দের মানে কী? মানে কি এই যে তারা সমাজতান্ত্রিক দেশও নয়, ধনতান্ত্রিক দেশও নয়। অন্য কিছু। ভারতবর্ষ এরকম অন্য কিছু দেশ। এসব দেশের মধ্যে সামাজিক অর্থনৈতিক একাত্মতা থাকতেই পারে। এবং এসব দেশ থেকে এক ধরনের নতুন কাব্য আন্দোলনও গড়ে উঠতে পারে। Anti Poetry তার কতটা কাছাকাছি জানিনা। তবে আফ্রিকান কবিতার আঙ্গিক (অবশ্যই বিষয়গ্রাহ্য আঙ্গিক) আমি লক্ষ করেছি। কিন্তু এসব নতুন নতুন আঙ্গিক নিয়ে আমাদের ভাবনার সুযোগ, অবকাশ কিছুই নেই। আমরা তৃতীয় বিশ্বের অধিবাসী কিন্তু আমাদের সব কিছুই প্রথম-বিশ্ব ঘুরে আমাদের হাতে আসে। খুব সংক্ষেপে, নির্বাসিত হয়ে, চুঁইয়ে আসার মতো। জোরটা ধরা যায়না। তাছাড়া কৌতূহল থাকলেও বিদেশ-বুদ্ধির ও মফঃস্বলে থাকার অসুবিধে তো আছেই। আশা করি Anti Poetry-র মধ্যে নতুন কিছু পাওয়ার আছে, আঙ্গিকের দিক থেকেও। T. S. Eliot তাঁর Possibility of Poetic Drama নামক রচনায় যে কথাগুলি বলেছেন, তা এখানে স্মরণযোগ্য। তাঁর বক্তব্যের উদ্ধৃতি দিয়েই এ অংশ শেষ করব "To create a form is not merely to invent a shape, a rhyme or rhythm. It is also realization of the whole appropriate content of this rhyme or rhythm. The sonnet of Shakespeare is not merely such and such a pattern, but a precise way of thinking and feeling. ...The framework which was provided for the Elizabethan dramatists was not merely blank verse, and the five act play and the Elizabethan play house; it was not merely the plot—for the poets incorporated, remodelled. It was also the 'temper of the age', a preparedness a habit on the part of the public, to respond to particular stimuli."

এতক্ষণ যা লিখলাম, নানাভাবে আঙ্গিকের গতিশীলতা, বিষয়ের সঙ্গে তার সম্পর্ক, নতুন নতুন মর্মবস্তুর জন্যে নতুন নতুন আঙ্গিকের বিকাশ—এসব, এসবই, একরকম গড়ে তোলার মতো ব্যাপার বলে মনে হল। আমিও বিশ্বাস করি, এভাবে হয়না। হয়না।

হয়। অন্যভাবে হয়। সে এক অতিবিরল অন্তরের উত্তাপে মাটি থেকে গড়িয়ে পড়া

রসে, মেধার স্বাদে সমস্ত অভিজ্ঞতার নির্যাসে এক ধ্যানময়তার ভিতর থেকে জেগে ওঠা স্পন্দন—। ভাষার মাধ্যমে তাকে ধরার জন্যে যা, যে রূপ, তাই-ই আঙ্গিক। কবিতার আঙ্গিক। তাকে কেউ 'আঙ্গিক' বলেনা। বলে কবিতা।

২

'বোধ্য হবার একটা দায় লেখকের থাকেই। তা যদি না থাকত, তা হলে কবিতা লিখে অন্যের কাছে প্রকাশ করার কোনো প্রয়োজন ছিলনা'—অরুণ মিত্র তাঁর 'কবিতা কী বলে কীভাবে বলে' নামক রচনায় একথা বলেছেন। কবিতা বোধ্য হবার প্রসঙ্গে ভাষার কথা এসেই যায়। শুধু ভাষাই বোধ্য হবার একমাত্র সর্ত নয় যদিও, তবুও, ভাষাই যেহেতু কবিতায় ভাব প্রকাশের একমাত্র মাধ্যম, তাই ভাষাকেই বোধ্য হবার ব্যাপারে প্রধান ভূমিকা নিতে হয়। এখন ভাষা যদি সহজ সরল লোকায়ত হয়, তাহলেই কি ভাব সহজবোধ্য হবে? মোটেও না। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর 'কাব্যের মুক্তি' নামক রচনাটিতে পরিষ্কার বলেছেন 'আসলে ভাষার সঙ্গত শাসন থেকে মুক্তি পাওয়া কাব্যের পক্ষে অসম্ভব। ...লেখক ও পাঠকের মধ্যে অনুকম্পার সেতুবন্ধই যদি কাব্যের উদ্দেশ্য হয়, তবে কাব্যের শব্দ চিরদিনই অভিধানের মুখাপেক্ষী থাকবে' ...' কেন অভিধানের মুখাপেক্ষী থাকবে? যদি কবি ও পাঠকের সম্পর্ক পারস্পরিক অনুকম্পার সম্পর্ক হয়। অনুকম্পা মানে কি? এখানে? একটা ক্ষীণ দূরত্বের আভাস নয় কি? এই দূরত্ব কেন গড়ে উঠবে? 'প্রাপ্তবয়স্ক শব্দ' মানেই যে তা অভিধান নির্ভর হতে হবে, একথাই বা অর্থ কি? প্রশ্ন হল—কবিতা বোধ্য হবে কি হবেনা। সীমাবদ্ধ, তথাকথিত পরিশীলিত কিছু পাঠকের কাছেই কেবল তার বোধ্য হওয়ার দায় থাকে, না কবিতার আরো প্রসারিত জায়গায় যাওয়ার দায় থেকে যায়। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর ঐ একই রচনার শুরুর দিকে বলেছেন "প্রথম কবিতার আবির্ভাব হয়েছিল কোনো ব্যক্তি বিশেষের মনে নয়, একটা মানব সমষ্টির মনে ; প্রথম কবিতার প্রসার একটি মানুষের উপরে নয়, সমগ্র জীবনের ওপরে..." । সে অবস্থা থেকে কবিতা সরে এসেছে, আসতে বাধ্য হয়েছে, নানা কারণে—ব্যুরোক্র্যাসিও সেই রকম বহু কারণের একটি কারণ। রাষ্ট্র, সমাজ, শ্রেণী,—ইত্যাদি প্রসঙ্গে বিশাল বিস্তার থেকে বিরত থেকেই বলছি, বাংলা কবিতা শাস্ত্র পদাবলী, বৈষ্ণব পদাবলীর যুগেও সমগ্র জীবনের ওপর প্রসারিত ছিল বলেই আমরা জানি। এবং তার ভাষাও যথেষ্ট প্রাপ্ত বয়স্ক ছিল বলেও আমরা জানি। প্রাপ্তবয়স্ক ভাষা না হলে অত চমৎকার কবিতাগুলি রচিত হওয়া সম্ভব ছিলনা। তখনও ঈশ্বরচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা 'ভাষা' গড়েন নি, গদ্য ভাষার জন্মই হয়নি। তবুও সে ভাষা অপ্রাপ্ত বয়স্কের ভাষা বলে তো মনে হয়না। একেই হয়ত সুধীন্দ্রনাথ দত্ত সান্ধ্যভাষা মনে করতেন, তাঁর অর্কেস্ট্রার ভূমিকাতে এভাবে ব্যক্ত করেছেন 'অর্কেস্ট্রার রবীন্দ্রনাথের একাধিক পংক্তি তো জ্ঞানে বা অজ্ঞানে এসে গেছেই, এমনকি সাধু ও প্রাকৃতের মধ্যবর্তী যে সান্ধ্য ভাষায় সে কালের অধিকাংশ বাংলা কবিতা লেখা হত, তাই এ গ্রন্থের বাহন।.....অনাবশ্যক বাহুল্য ইত্যাদি বাংলা পদ্যের

সুপ্রচলিত যথেচ্ছাচার অর্কেস্ট্রার সর্বত্র ছড়িয়ে আছে।' —এ ভাষা সান্ধ্য ভাষা ঠিকই, কিন্তু এ ছিল সেদিনকার সমাজের কাব্য ভাষাও। এবং যথেষ্ট পরিণত ধ্বনি-বিধৃত ভাষা। একে আমরা শিশু সুলভ ভাষা বলে দিতে পারি না। আমরা আর ও-ভাষা ব্যবহার করতে পারি না ঠিকই, কিন্তু ঐ ভাষা জনজীবনকে ছুঁতে পেরেছিল, কবিতার সব রকম প্রসাদগুণ সহই যে ছুঁতে পেরেছিল, তার কারণ কি? আসলে ঐ ভাষায় ব্যুরোক্র্যাসি ছিল না।

সুধীন্দ্রনাথ দত্তের একটি সুন্দর আধুনিক মন ছিল। তাঁর কবিতায় কোথাও কোথাও তা ঝলকে উঠেছে। কিন্তু তাঁর ঐ ভাষা প্রসঙ্গে কথা-বার্তাগুলো সেদিক থেকে আমার আধুনিক বলে মনে হয় নি। আমি সুধীন্দ্রনাথ দত্তের উদ্ধৃতি তুলেছি অন্য কারণে। ডিকশানারি দেখে একটা নতুন শব্দ বুঝে নিতে আমার আপত্তি নেই, কিন্তু কবিতার ভাষায় ব্যবহৃত শব্দ ডিকশনারি খোঁজা হবে কেন? —এটা আমাকে বিভ্রান্ত করে।

সত্যিই তো, কবিতার ভাষা ব্যাপারটা কি, সেটার একটা আন্দাজ পাওয়ার দরকার আছে। অক্ষর আবিষ্কারের আগে যে কবিতা লেখা হয়েছিল তার ভাষা কেমন ছিল? পণ্ডিত ব্যক্তিরা বলেন, উচ্চ-গ্রামের ভাষা ছিল তা। কবিতার সঙ্গে মিশে থাকত তখন সঙ্গীত ও নৃত্য। কবিরা তখন ছিলেন ওঝা। —enchant করার মতো ভাষা অর্থাৎ বিমুগ্ধ করার মতো ভাষার তখন দরকার ছিলই। কবিতার ভাষার শরীরে সেই—আদিম ঐতিহ্য তো এখনো রক্তের মতোই বয়ে চলেছে। অর্থাৎ কবিতার ভাষাকে এমনই হতে হবে যা বিমুগ্ধ করবে পাঠককে। কবি এখন আর ওঝা, বা পুরোহিত, বা এমনকি চারণ কবিও নন যে তাঁর অন্য অনেক সামাজিক দায়িত্ব বা রাজনৈতিক দায়িত্ব পালন করতে হবে। তবু পাঠককে তো বিমুগ্ধ করতেই হবে তাঁকে। তিনি তাহলে কোন ভাষায় কথা বলবেন? —এই ভাষা সমস্যা সারা পৃথিবীর কবিদেরই সমস্যা। বিশেষত আধুনিক যুগে। এ বিষয়ে উদ্ধৃতি কণ্টকিত করে লাভ নেই। সোজাসুজি আমি যা বুঝি, তাই বলি। সুধীন্দ্রনাথ দত্তের মতাবলম্বী মানুষের অভাব নেই। আবার অরুণ মিত্রের মতো মানুষেরও অভাব নেই। অরুণ মিত্র তাঁর একটি লেখায় বলেছেন 'লেখক বিশেষ কিছু করতে চায়। এই চাওয়াটা আমার ক্ষেত্রে ছিল আমার ভাষাকে সারল্যে প্রতিষ্ঠা করা, অর্থাৎ তাকে মুখের কথার কাছাকাছি নিয়ে আসা। এজন্যে আটপৌরে শব্দ এবং দেশজ শব্দ ও শব্দগুচ্ছের প্রতি আমার টান বাড়তে থাকে।' —অরুণ মিত্রের এ মতকে সমর্থন করার মানুষেরও অভাব নেই, অবশ্যই।

ভাষা তো ভাব প্রকাশের মাধ্যম বটেই। তা ছাড়াও ভাষার মধ্যে দিয়ে বক্তার স্বভাব, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, রুচি এ সবও ফুটে ওঠে। এছাড়াও ভাষা যখন একটা জাতির ভাব প্রকাশের ব্যাপার হয় তখন তা নানান জাতীয় চরিত্র, রুচি, বৈশিষ্ট্য ইত্যাদির ধারক হয়। কাজেই ভাষা ব্যাপারটার সঙ্গে ব্যক্তিমানস, জাতীয় মানসের নানান বৈশিষ্ট্য জড়িয়ে মিশিয়ে থাকে। ভাষা যথেচ্ছাচার সহ্য করে না। এবং

ভাষা সমাজ, জীবন—তার ধারাবাহিক চিন্তা ভাবনার দ্যোতনার মধ্যে দিয়ে প্রতিদিন একটু একটু করে পরিশীলিত হয়। ভাষার একটা সর্ব-সাধারণ-গ্রাহ্য রূপ থাকে। এবং তা গতিশীল।

তবে সাহিত্যের ভাষার সঙ্গে মুখের ভাষা, লেখার ভাষার সঙ্গে কথ্য-রীতির ভাষার পার্থক্য আছেই। আবার গদ্য সাহিত্যের ভাষা, সমালোচনা সাহিত্যের ভাষা, প্রবন্ধ সাহিত্যের ভাষার সঙ্গে রম্যরচনার ভাষার পার্থক্য দেখেছি—এবং এসব গদ্য সাহিত্যের প্রতিটি ভাষার সঙ্গে কবিতার ভাষার পার্থক্য আমরা বেশ বুঝতে পারি, বলাই বাহুল্য। এবং নাটক যেহেতু সংলাপ-নির্ভর, আর নাটক যেহেতু ডিরেক্ট আর্ট মিডিয়াম, তাকে সরাসরি এক সঙ্গে বহু মানুষকে পরিতৃপ্ত করতে হয়—তাই তার ভাষারীতি অন্যরকম হয়। সংলাপ এক সময় high speech ছিল। সে যুগের রুচি বদলেছে, তাই নাটকের সংলাপের ভাষা কথ্যরীতির ভাষায় নেমে আসতে বাধ্য হয়েছে।

নাটকের সঙ্গে বহু রকম মিল থাকা সত্ত্বেও, এবং নৃত্য, নাট্য ও কবিতা একইসঙ্গে আদিম কালে জন্মলাভ করা সত্ত্বেও তার ব্যবধানও সুদূর হয়েছে সাম্প্রতিক যুগে। সেটা ঐ Art form-এর পার্থক্যের জন্যেই হয়েছে। তাহলে দেখা গেল সাহিত্যের প্রতিটি মাধ্যমের জন্যে আলাদা ধরনের ভাষারীতিও গড়ে উঠেছে। প্রতিটি ভাষারীতিই স্বয়ং সম্পূর্ণ এবং বিশিষ্ট। এটা এক নজরে যে কোনো সাধারণ পাঠকও বুঝতে পারেন। এবং এর প্রতিটিই ভাব-প্রকাশের স্বার্থেই স্বতন্ত্র মাধ্যমের জন্যে স্বতন্ত্রভাবে গড়ে উঠেছে। কবিতার ভাষায় উপন্যাস লেখা যাবে না। সে হাস্যকর ব্যাপার হবে। অত বেশি ব্যঞ্জার্থ উপন্যাসে মাননসই নয়। আবার নাটকের সঙ্গে কবিতার ভাব-ভাষার মিলন হলে তা কাব্য নাট্য হয়ে যায়। কাব-নাট্যের ব্যাপারে এলিয়টের Possibility of Poetic Drama স্মরণীয়। বেলে লেতায়-এর রম্যতাও যে এক ঢিলেঢালা ব্যক্তিগত মেজাজী কারুকাজের সমৃদ্ধি এনেছে গদ্যে এবং এক নতুন ভাষা-রীতির জন্ম দিয়েছে—তা কেবল বেলে লেতায়েই সার্থক। এসব আমরা সকলেই কিছু কিছু জানি। হ্যাঁ, কবিতার ভাষা। বোধ্যতা দুর্বোধ্যতার জন্যে ভাব, আঙ্গিক এ সবও যেমন সম্পর্কযুক্ত—ভাষা হয়তবা সবচেয়ে বেশি সম্পর্কযুক্ত। ভাষার সর্বজনগ্রাহ্যতা ও ভাষার ব্যঞ্জনা এক জিনিষ নয়। উপন্যাসের ভাষায় আমরা প্রথমে দেখব সর্বজনগ্রাহ্যতা ও পরে দেখব তার সৌন্দর্য ও ব্যঞ্জনা। এবং শেষ পর্যন্ত দুয়ের সমন্বয় করব। কবিতার ভাষায়ও এ রীতিই গ্রাহ্য হওয়া উচিত, তবে সমান সমান মাপে। কেননা সে ভাষাকে বাচ্যার্থ উত্তীর্ণ হতেই হবে। একটা ঘন ভাবানুভূতি তার শরীর জড়িয়ে থাকবেই। যে কোনো কেজো কথা বাচ্যার্থেই সীমাবদ্ধ থাকে। তবু, কোনো কথার মধ্যেও রকম ফের আছে। একজনের কথার Delivery শুনলে গা জ্বালা করে, আবার কারো কারো কথা দাঁড়িয়ে শুনতে ইচ্ছে হয়। কিন্তু সাধারণভাবে—কেজো কথা বাচ্যার্থের চেয়ে বেশিদূর যায় না। সাহিত্যের, প্রতিটি সাহিত্যের মাধ্যমের ভাষাতেই, এই কেজো কথায় একটু ব্যঞ্জার্থ যুক্ত হয়, তবেই তা রসমণ্ডিত হতে

পারে। যে কারণে উপন্যাসের টানা গদ্যের ভাষাতেও রস জমে থাকে। তবু, উপন্যাসের ভাষা আর কবিতার ভাষা এক নয়। বলাই বাহুল্য।

আগেই হয়ত বলেছি যে কবিতার ভাষার রক্তে আদিকালের ম্যাজিক-প্রতিক্রিয়ার হিমোগ্লোবিন আজো আছে। নাটক ছাড়া সাহিত্যের অন্যান্য মাধ্যমগুলি অর্বাচীন কালের। নাটকও বহু পরে এসেছে। যদিও ড্রামার অ্যাকশন কবিতার সঙ্গে একই সাথে জন্মেছে—অপেরার নাচ-গানও কবিতার সমবয়সী তবু, কবিতার শরীরের সঙ্গে ডালপালার মতো আদিতে এরা জুড়ে ছিল, পরে খসে পড়ে তা নিজ নিজ মূর্তি ধারণ করেছে। তা হলে কবিতার ভাষার স্বাতন্ত্র্য ব্যাপারটা আজকের নয়—জন্মলগ্নের—সেই গুহাবাসী জীবনেরও আগের জীবনের। কবিতা নাকি ছিল 'সংকেত' নামক হাতিয়ার। জীবনের বিপদে আপদে, সুখে সম্পদে তা ঐ 'সংকেত' নামক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হত। কাজেই কবিতা, Specturm Tersier-এর সঙ্গে সঙ্গে বিবর্তিত হতে হতে বৈপ্লবিক রূপান্তরের মাধ্যমে নতুন রূপ নিয়েছে। তাহলে, কবিতার রক্তের দুটি আদি উপাদান হল (১) ম্যাজিক (২) সংকেত। আদিরূপে কবিতার ঐ ইন্দ্রজাল ও সংকেত দৈনন্দিন বিশেষ বিশেষ সংবেদন তৈরী করে কাজের প্রেরণা যোগাতো হয়ত বা। স্পেকট্রাম টারসিয়ার-এর কোনো ভাষাই ছিল না। হয়তবা রব ছিল মাত্র, স্বর ছিল। কিন্তু কবিতা অতদূরই প্রসারী—। স্পেকট্রাম টারসিয়ারের ছোট আর কুঁড়ে শরীরে ছিল বিশাল দুটি চোখ, যে চোখ দিয়ে সে গাছের শাখায় বসে গভীর বিস্ময়ে সব কিছু দেখত। অন্য প্রাণীর অতবড় চোখ ছিল না। ওরা সংকীর্ণ কেজো জায়গাটুকুই কেবল দেখতে পেত। কারও পক্ষেই জানা সম্ভব নয় tersier group-এর ঐ বিশেষ জীবটি তার বিশাল গগল্‌স্-এর মতো চোখ দিয়ে যে বিস্ময়কর প্রকৃতি দেখত, তার স্বর বা রবে তার প্রকাশ কিভাবে ঘটত। 'আহ্'-'ওহ্' এরকম শব্দ কি সে-ই প্রথম গড়ে তোলে? শব্দের এই যে গঠন, তা নাকি শিকারের উল্লাস, যৌন মিলনের শীৎকার, প্রকৃতির প্রতি ভয় আর বিস্ময় থেকেই জন্ম নিয়েছে—আদি রূপে। উল্লাস, শীৎকার, ভয় এবং বিস্ময় শব্দগুলি থেকে এমনিতেই যে সংবেদন পাওয়া যায়—তা যে সুপ্রাচীন, যে চিত্রটি ভেসে ওঠে তা যে আদিম—একথা মনে হয়। কবিতার ভাষা কাজেই বিস্ময়ের, উল্লাসের, সুখের, আরামের, ভয়ের ভাষাও। অর্থাৎ ভাষার height কবিতায় খানিকটা থেকে যায়। এই উচ্চতা বস্তুটা কেজো ভাষার সঙ্গে তুলনা করলেই বোঝা যাবে। বস্তুত, সাহিত্যের সব ভাষাতেই কেজো ভাষার তুলনায় একটু উচ্চতা এসে যায়: একটা মন, একটা চেতনা স্রোত, কিছু সংবেদনশীলতা সাহিত্যের ভাষায় জড়িয়ে থাকে বলেই তা বিশেষ উচ্চতা লাভ করে। সহজ, কঠিন, দুর্বোধ্য, সুবোধ্য—নয়। উচ্চতা। এবং এই উচ্চতাটুকুও আদিকালের থেকে ভাষায় জড়িয়ে আছে। অর্থাৎ (১) ম্যাজিক, (২) সংকেত, (৩) উচ্চতা। কবিতার ভাষার এই যে ম্যাজিক, সংকেত, উচ্চতা এ নিয়ে বহু চিন্তাশীল মানুষই ভেবেছেন, তা আমরা জানি। আমি মৌলিক চিন্তার অবদান যাঁদের আছে, তাঁদের কিছু কিছু কথা এখানে

বলার চেষ্টা করব। 'Poetry is composed of words' এই উপনামে Christopher Caudwell এক পৃষ্ঠার কিছু বেশি একটি চুম্বক আলোচনা লিখেছেন তাঁর Illusion and Reality নামক বিখ্যাত বইটিতে। সেখানে দুই বিখ্যাত কবির দুটি মন্তব্য আছে। Mathew Arnold নাকি বলেছেন 'For poetry the idea is everything ; the rest is a word of illusion, of devine illusion. Poetry attaches its illusion to the idea ; idea is the fact'—কবিতার ক্ষেত্রে 'idea'ই সব, ইলিউশন (বিভ্রম ?) সৃষ্টিকারী শব্দ তার পর। আবার ঠিক এর বিপরীত মন্তব্য করেছেন Mallarmé তাঁর শিল্পী বন্ধুদের কাছে 'Poetry is written with words, not ideas. একেবারেই উল্টো কথা। এভাবে আমরা কেউ কোনোদিন ভাবিও নি। কিন্তু ভাবনার যথেষ্ট অবকাশ আছে। পরে সেখানে যাবার চেষ্টা করব। কিন্তু একথা ঠিক যে word—শব্দ—একটা idea বা চিন্তাস্রোত ধরেই আসে। অযথা কিছু word বসিয়ে দিলে তা কিছুই হয় না, যদি না তার পিছনে চিন্তার কোনো তাগিদ থাকে। ঐ দুই চূড়ান্ত পরস্পর বিরোধী মন্তব্যের synthesis সম্ভবত এই রকম যে, কবিতার ভাষা 'idea' দ্বারা নিয়ন্ত্র এবং ঐ 'idea'—'word' দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। অর্থাৎ word বা শব্দের একটা বড়রকম ভূমিকার কথা সবাই মানবেন—কবিতার ক্ষেত্রে। সে কারণে গদ্যের ভাষার শব্দে খুব বেশি illusion মানায় না, কিন্তু কবিতার ভাষার শব্দে illusion থাকাটা জরুরী হতে পারে। মানিয়েও যায়। অর্থাৎ 'শব্দ' একটা অপরিহার্য সত্য হয়ে ওঠে কবিতার ক্ষেত্রে। আমরা জানি বিজ্ঞানের ভাষা Symbolic, যেমন ১, ২, + − × ÷ ইত্যাদি অঙ্ক ও চিহ্ন। ভিতরে কোনো illusion নেই। কিন্তু তাতে জগৎ সংসারের বিরাট বিরাট 'idea' ধরা হয়েছে ও হচ্ছে। এবং আইনস্টাইনের জীবনী পড়ে তো মনে হয়—এর মধ্যে তিনি যা রসানুভূতি পেতেন তা যে কোনো শিল্প সাহিত্য থেকে পাওয়ার চেয়ে কম নয়। বার্টাণ্ড রাসেল তো অঙ্ক কষে চরম আনন্দ উপভোগ করতেন। প্রসঙ্গ রসের উপাদান, রসবস্তু নয়। তাই প্রসঙ্গান্তরে গিয়ে বলা যায় যে, সাহিত্যের ভাষায় বা বিশেষ করে কবিতার ভাষায় illusion থাকাটাই ধর্ম, বিজ্ঞানের ভাষায় illusion না-থাকাটাই ধর্ম। আর কবিতার ভাষা illusion মাখানো শব্দেই গড়ে ওঠে। এবং এই illusion বস্তুত শব্দের abstraction থেকে তৈরী হয়। Francis Bacon তাঁর Novum Organum-এর LX পরিচ্ছেদে ভারি চমৎকার কথা বলেছেন। তিনি humidity (আর্দ্রতা) শব্দটি বেছে নিয়ে শব্দের abstraction-এর ব্যাপারটা চমৎকার বুঝিয়েছেন। তাঁর ঐ আলোচনা থেকে শব্দের যে illusion গড়ে তোলার ক্ষমতা কত তা বুঝতে পারি। আগেই বলেছি—শব্দের abstraction-ই তাকে illusive করে। Bacon বলেছেন 'The idol imposed by words on the understanding are of two kinds. They are either names of thinks which do not exist (for as there are things left unnamed

through lack of observation, so likewise are there names which result from fantastic suppositions to which nothing in reality corresponds), or they are names of thing which exists, but yet confused and ill defined, and hastily and irregularly derived from realities." বেকন প্রথম ধরনের শব্দকে বলিষ্ঠতার সঙ্গে বরবাদ করতে বলেছেন, কারণ প্রথম ধরনের শব্দ মিথ্যে আর কুঁড়ে সব তত্ত্বের সাহায্য করে। এদের হাত থেকে রেহাই পেতে হবে। যেমন ধরা যাক 'ভগবান' শব্দটি। ওঁর যুক্তি অকাট্য, কিন্তু কবিরা কি এরকম শব্দ বাদ দেবেন ? এখানেই কবির শব্দ ও শব্দপুঞ্জের সাহায্যে গড়া ভাষার সঙ্গে দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকদের ভাষার পার্থক্য। যাই হোক, এই পরিচ্ছেদে তিনি তাঁর দ্বিতীয় পর্বের শব্দগুলিকে, অর্থাৎ সেইসব শব্দ 'they are names of things which exits'—থেকে humidity (আর্দ্রতা) শব্দটি বেছে নিয়ে তার abstractjon-এর ব্যাপারটা বুঝিয়েছেন। (একটু নিন্দার্থে, কেননা, তাঁর মতে, abstraction ব্যাপারটাও ভালো না, কেননা, তা 'out of faulty and unskillfull' মানসিক অবস্থা থেকে জন্মেছে)। আর্দ্রতা শব্দটিতে কত কি না বোঝায়। যেমন, যা সহজে ও দ্রুত অন্যান্য বস্তুর ওপর ছড়িয়ে পড়তে পারে, এবং যা নিজেই ভারি চপল স্বভাবের, যার কোনো জমে যাওয়ার শক্তি নেই, শক্ত হতে পারে না, এবং যা সব জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে, নানা দিকে, এবং যা সহজেই ভাঙে ও ছিটিয়ে পড়ে, যা দ্রুত ছোটে, এবং যা গতিশীল, যা আবার সহজেই একত্র হয় ও নিজেকে গুটিয়ে নিতে পারে, যা সহজে অন্যবস্তুকে ঘা দেয় ও তা ভিজাতেও পারে, যা গুটিয়ে তরল পদার্থে পরিণত হতে পারে, সেই তরল পদার্থ জমেও যেতে পারে, আবার গলেও যেতে পারে ; একটু জমলে যা কুয়াশা হয়, এবং যা রোদের তাপে বাষ্প হয়, বাতাসের রুক্ষতা নষ্ট করে, আবার বাতাসকে ভ্যাপসা করে ইত্যাদি ইত্যাদি। এইভাবে অন্যান্য নানা অর্থ হয়, এর স্বচ্ছতার একটা ভাব আছে, যেমন, বলা যায় 'flame is humid' বা 'air is not humid' বা 'fine dust is humid' বা 'glass is humid' ইত্যাদি ইত্যাদি। আসলে, 'আর্দ্রতা' 'জল' থেকে আসা জলের একটা ধর্ম—যা একরকম abstract notion তৈরী করেছে। Bacon বলেছেন 'the human understanding is of its own nature prone to abstraction and gives a substance and reality to things which are fleeting." এবং For men believe that their reasons govern words ; but it is also true that words react on the understanding.' মানুষের প্রকৃতি যেন abstraction-এর দিকে নত হয়ে যা কিছু ভাসমান, বহমান, তাকে সারবত্তা ও বাস্তবতা দেওয়ার জন্যে ঝুঁকে আছে, এবং মানুষের ধারণা যে শব্দই তাদের বোধ-বুদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করছে। আমরা হয়ত ম্যালার্মের ঐ উক্তির খানিকটা কাছে যেতে পেরেছি। শব্দই ব্রহ্ম। শব্দই idea। —না, এভাবে ভাবলে ভাষা হয় না। ভাষা ভাবের রূপ। শব্দ ভাষার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, শরীর গড়ার মশলা।

কবিতার ভাষার শব্দ বড় জোর একটু abstract—যা illusion তৈরী করে, যেমন 'আর্দ্রতা' শব্দটি। কবিদের বরং উচিত বাতিল হয়ে যাওয়া এমন সব শব্দ—যেমন ঈশ্বর, কিম্বা 'skillful' নয় এমন শব্দ, আর্দ্রতা, শূন্যতা, প্রেম, হৃদয়—এই সব শব্দের দিকেই মাথা ঝুঁকে থাকা—কোনো ভাসমান, বহমান বোধকে, ধ্যানকে, 'idea'-কে সারবত্তা ও বাস্তবতা দেওয়ার জন্যে কবির কাছে কোনো শব্দই বাতিল বলে গ্রাহ্য নয়, কোনো শব্দই unskillful নয়। বরং বহুরকম ব্যঞ্জনা আছে এমন শব্দ—আর্দ্রতা কবিদের কাছে বেশি প্রিয়। আমাদের জীবনের, সংসারের ভিতর দিয়ে বয়ে চলেছে অনুভূতির প্রগাঢ় স্রোত। যার সামান্যই হয়ত আমরা আজ পর্যন্ত ধরতে পেরেছি। একমাত্র অংক ও বিজ্ঞানের শব্দই যথার্থ skillful—কেননা তা ১ থেকে ৯ ও ০ এবং কিছু symbolic চিহ্ন দ্বারা কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত এবং বিজ্ঞান তার ভাষা তৈরী করে ঐ চিহ্নের পর চিহ্ন সাজিয়ে। নতুন চিহ্নের জন্ম দেয় নতুন আবিষ্কারকে চিহ্নিত করার জন্যে। এ হল বিজ্ঞানের ভাষার পদ্ধতি। বিজ্ঞানীদের চিন্তায় কি abstraction থাকে না? বিমূর্ত অবস্থাতেই তা প্রথমে আসে। পরে তা সাধারণ সিদ্ধান্তের রূপ নিয়ে নিজস্ব ভাষা পায়। কিন্তু কোনো বিজ্ঞানীই তাঁর স্ত্রীর কাছে পিপাসার্ত হয়ে বলবেন না, এক গ্লাস H_2O দাও। হয়ত বোঝা গেল, সাহিত্যের ভাষা ও বিজ্ঞানের ভাষা এক নয়। এ ভাবেই বলা যায়, ভূগোলের ভাষা, বা রাষ্ট্রনীতির ভাষা বা অর্থনীতির ভাষা—এমনকি দর্শনের ভাষা ও সাহিত্যের ভাষা এক নয়। আবার সাহিত্যের প্রতিটি ভাষার আলাদা আলাদা রূপ থাকে, বলাই বাহুল্য। 'সাধারণভাবে গদ্য হল যুক্তির অধীনে পর্যবেক্ষণশীল, বিচারশীল বুদ্ধির ভাষা, আর কাব্য হল 'গৌণত বুদ্ধির সাহায্যে সৃজনশীল কল্পনা ও অনুভূতির ভাষা।' অরুণ মিত্র তাঁর 'কবিতা কী বলে ও কীভাবে বলে' নামক রচনায় একথা বলেছেন। অর্থাৎ গৌণত বুদ্ধির সাহায্যে সৃজনশীল কল্পনা ও অনুভূতির ভাষা'। অর্থাৎ 'কল্পনা ও অনুভূতির ভাষা'। অর্থাৎ ভাবের ভাষা। ভাবের ভাষা হল কবিতার ভাষা। আমরা ম্যালার্মে কথিত শব্দ লিখি না, বরং আর্নল্ড কথিত ভাব লিখি। আগে বেকনের বাতিল করে দেওয়া absolute শব্দগুলি (ঈশ্বর, ভূত) ও unskillful (আর্দ্রতা, প্রেম, হৃদয়) শব্দগুলি, যে শব্দগুলি abstraction তৈরী করে, অর্থাৎ যে শব্দের 'Existence' 'confusing' নয় (বাক্স, বিছানা, বই ইত্যাদি ইত্যাদি) এমন শব্দগুলিও কবির খুব প্রিয়। অর্থাৎ, কেবলমাত্র confusing নয় এমন শব্দগুলির ওপর নির্ভরশীল হলে কবির ভাবানুভূতির প্রকাশে খুবই কষ্ট হবে। এবং তা হবে একরকম tyaranni—অত্যাচার। তাছাড়া একেবারে বিজ্ঞানের শব্দ অর্থাৎ ঐ H_2O বস্তুত কোনো শব্দও নয়। এমনকি ঐ শব্দে জলকেও বোঝায় না। বরং এমন দু ভাগ মৌল বস্তুর সঙ্গে একভাগ মৌল বস্তুর মিশ্রণ বোঝায়—যা বস্তুত দুরকম আলাদা ধূলিকণা। কাজেই ওটা ভাষাও নয়। কেননা ওটা কথা নয়। Symbol। কথা অর্থাৎ মনের ভাব প্রকাশের জন্যে মানুষ যা বলে থাকে তাই ভাষা। মানব গোষ্ঠীর নিজ নিজ অংশের ও অঞ্চলের মধ্যে কথা বলাকে ভাষা বলে। এই ভাষার বোধগম্যতা থাকা

আবশ্যিক হয়। অর্থাৎ ভাষার একটি প্রধান ধর্ম হল গোষ্ঠী বা আঞ্চলিক সমাজজীবনের বহু অভিজ্ঞতায় যাচাই হয়ে আসা এরকম বোধগম্য 'কথা' বলাকেই ভাষা বলে। এই কথায় 'শব্দ' থাকে। কিন্তু 'কথা'র মধ্যের শব্দ এবং বাইরের বিচ্ছিন্ন কোনো শব্দ এক নয়। কথার মধ্যেকার শব্দের নানান শোষণ-সংকোচন-ব্যাপ্তি ইত্যাদি ঘটে যায়। এটা কথা বলার রীতির সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে। তখন শব্দ 'পদ' হয়। আসলে শব্দ পদে পরিণত না হওয়া পর্যন্ত ভাষা গড়তে পারে না। তাই বিজ্ঞানের H_2O ভাষা হয় না। কেননা তা কখনও পদ হয় না। কেননা তার কখনো শোষণ-সংকোচন-ব্যাপ্তি ইত্যাদি প্রতিক্রিয়া নেই। শব্দগুলি বা শব্দ পদে পরিণত হয়ে শ্রেণী চরিত্র লাভ করে। এবং এক-এক শ্রেণীর শব্দ এক এক প্রতিক্রিয়ায় কাজ করে। এভাবেই একটা অর্থপূর্ণ ভাষা হয়। মানুষ যখন মনে করবে ভূত, ভগবান ইত্যাদি শব্দগুলির পদমর্যাদা নষ্ট হয়েছে, এবং তার অভিজ্ঞতা থেকে যখন বুঝবে যে এসব শব্দ যেহেতু কোনো বস্তুর অস্তিত্বকেই বোঝাচ্ছে না, অতএব পরিত্যাজ্য তখন হয়ত তা ব্যবহৃত না হতে হতে obsolete হবে। এবং আগামী কালের কোনো এক সুদূরে গিয়ে হারিয়ে যাবে। মনে রাখা দরকার, ভাবের যথার্থ অনুকূলে এসেই শব্দ পদে পরিণত হয়। এবং তখন শব্দ আর একা থাকে না। একটি গোষ্ঠীর মধ্যে সে তার নিজ ভূমিকায় থাকে। তখন একক শব্দ যতই abstract হোক না কেন, খুবই solidized হয়ে যেতে পারে। ধরা যাক ঐ 'আর্দ্রতা' শব্দটিকেই। যার বিভ্রান্তি সৃষ্টি করার অসীম ক্ষমতা তা-ই কিনা যখন 'এখানকার বাতাসে আর্দ্রতা বেশি' বা 'মরুভূমির বাতাসে আর্দ্রতা কম' এরকম দলবদ্ধ শব্দের মধ্যে আসে তখন সে আর খুব বেশি abstract থাকে না। তখন শব্দটির প্রচুর সংকোচন ঘটে যায়, তার প্রতিক্রিয়ায় যে কোনো existence-কেই সে চিহ্নিত করতে পারে। তাই শব্দের নিজের শক্তির অসীমতা বা তুচ্ছতা বা সফলতা খুব সামান্যই। তাকে 'পদ' হয়ে উঠতে হয়ই। এবং কোনো একটা শ্রেণীতে (বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্বনাম, অব্যয়, ক্রিয়া) আশ্রয় নিয়ে তার ভূমিকাটি পালন করতে হয়। তখন 'রাম' কখনো ছাগল হয় আবার 'রাম' কখনো রাজাও হয়। যাই হোক, শব্দ আসে ভাষার মধ্যে মনোভাব প্রকাশের প্রয়োজনে। এবং সেভাবেই তার গড়ে ওঠা, সেভাবেই তার টিকে থাকা নির্ভর করে। এবং সেভাবেই তার রূপান্তরও হয়। এর চেয়ে বেশি গুরুত্ব শব্দের নেই। 'আমি ভাব লিখিনা, শব্দ লিখি'—এরকম মন্তব্যে আমি তৃপ্তি পাই না। সম্ভবত, এরকম মন্তব্যের মধ্যে একটা লুকোনো অভিপ্রায় আছে, তা হল, ভাব তো মনে কতই জমছে, তার প্রকাশের ভাষা নির্মাণের উপযুক্ত শব্দেরই যেন অভাব। তখন শব্দই হয়ে ওঠে বেশ গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু আমার বিশ্বাস, ভাব গভীর হলে শব্দের খুব অভাব হয়না। তাছাড়া, ভাষা ব্যাপারটাই এমন যে, তা শব্দকে খানিকটা শোষণ করবেই। ভাব ও তার ভাষার মধ্যেকার ঐ দ্বন্দ্বে 'পদ'কে দোষ-গুণে স্নাত হতে হয়ই। এবং কবিতার ভাষায় শব্দ আরো মারাত্মক হয়ে উঠতে পারে—দোষে। এবং সে কারণেই কবিকে সবসময়ই সচেতন থাকতে হয় তার গুণটুকু ভাবের অনুকূলে নিঙড়ে নেওয়ার জন্যেই। এই সচেতনতা

বস্তুত শব্দ সচেতনতাই। কিন্তু তা হয় সর্বদা ভাবের আগে ভাষার ইন্দ্রজাল, উচ্চতা ইত্যাদি বললে প্রায় কিছুই বোঝায় না। বরং ভাবের বিমূর্ততার সঙ্গে এদের সম্পর্ক কি ও কেমন তার উপরই ঐ Magic, height—এই শব্দগুলি নির্ভরশীল। 'ভাব' এই ধারণাটাই বিমূর্ত ধারণা। এরও কোনো মানে হয়না, যদি না ভাবের সঙ্গে 'ধ্যান' যুক্ত হয়। কোনো গভীর তন্ময়তাই কেবল বিশুদ্ধ ভাবের জন্ম দিতে পারে—যা কাব্যরূপও পেতে পারে। বিশুদ্ধ এই অর্থে যে তা নরকের ব্যাপারেও যতটা খাঁটি, স্বর্গের ব্যাপারেও ততটাই। এই বিশুদ্ধতাই কেবল ভাবকে বিশ্বাসযোগ্য করতে পারে, দুঃস্বপ্নও বিশ্বাসযোগ্য হয়, উৎকল্পনা হয় না। ভাব যতই বিমূর্ত হোক, তা যদি উৎকল্পনা না হয়, তা হলে তা কবির কাছে অপ্রিয় হবে না। কিন্তু ভাব যতই বিমূর্ত হোক, তারও শৃঙ্খলা আছে। এই শৃংখলা ধ্যানের প্রতিক্রিয়া। ধ্যানের তন্ময়তা কখনো ভাবকে উচ্ছৃঙ্খল হয়ে উদ্ভট বা উৎকাল্পনিক হতে দেয়না। ভাবের অপর নাম তন্ময়তা দেওয়া যেতে পারে! এই তন্ময়তা তার নিজের ভাষারূপ গড়ে তোলার জন্যে সংগ্রহ করে নেয়। আসলে, যতদূর মনে হয়, ধ্যান abstractionকে subjective পর্যায়ে নিয়ে যায়। তার মানে abstraction ও subjectivity এক জিনিষ নয়। abstraction deduced from Subjective = Cause to undergo = ধ্যান।

এই জটিল প্রক্রিয়া হয়ত কবির কাছেও রহস্যময় মনে হতে পারে। কেননা ধ্যানই ইন্দ্রজাল। গভীর মন্ময়তাই ইন্দ্রজাল। এবং তখন ঐ অবস্থায় আহরণ করা একটা তুচ্ছ শব্দও ইন্দ্রজাল-শক্তি অর্জন করে। একটা উচ্চতা পেয়ে যায়। 'দুয়ার এঁটে ঘুমিয়ে আছে পাড়া'—এই কাব্য-পংক্তিটির শব্দগুলি ব্যবহারিক, দৈনন্দিন এবং তুচ্ছই বলা চলে। কিন্তু খানিকটা ইন্দ্রজাল-শক্তি ও উচ্চতা সে এভাবেই লাভ করেছে। যার ফলে এ ভাষা একটা কাব্য শরীর পেয়েছে। কোনো অতি-আচারী শব্দ নেই। ধ্যানটুকু ধরতে সক্ষম কেবল এই তার যোগ্যতা। ভাষাকে পাভ্‌লভ্‌ নাকি বলেছেন condition-reflex, জীবন্ত স্নায়ুর প্রতিক্রিয়া। ধ্যান স্নায়ুকে জীবন্ত করে হয়ত। যেমন 'গং' শব্দটি কুকুরের ক্ষুৎ কাতরতা বাড়ায়। 'গং' ঘণ্টা-ধ্বনিটি একটা signal. কুকুরের কাছে তা সংবেদন, ক্ষিদের সময়ের নির্দেশক। কবিতার ভাষা খুবই উচ্চাঙ্গের সংবেদন গড়ে তোলার একরকম সিগ্‌ন্যাল। আদিম অবস্থার ভয়, ত্রাস, আনন্দ, যৌনমিলনাঙ্কার signal-গুলিই বহু অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে ধ্যানে পরিশীলিত হতে-হতে এখন কবিতাকে বহন করার শক্তি অর্জন করেছে। সেই আদিম chant এখন বহুগুণ পরিশীলিত হয়ে ব্যঞ্জনায় রূপান্তরিত হয়েছে। 'কবিতার মুক্তি'-তে সুধীন্দ্রনাথ দত্ত কবিতার ভবিষ্যৎ মৃত্যু-আশংকায় ভীত হয়েছিলেন। আমরা দেখছি, ভয় পাওয়ার কিছুই নেই। কেননা, কবিতা মানুষের স্বভাবে আদিকাল থেকেই আছে ও তা পরিশীলিত হচ্ছে, ও অগ্রসর হচ্ছে। সামাজিক জীবনের নতুন নতুন অভিজ্ঞতা কবিতায় ভাষা রূপ পাচ্ছে। ধারাবাহিক-ভাবে কবিতার মর্মবস্তু ও ধ্যানের ইতিহাসটি যদি কারো পক্ষে কখনো গড়ে তোলা সম্ভব হয়, তাহলে এটা খুবই পরিষ্কারভাবে বোঝা যাবে। আরো বোঝা যাবে যে

অজ্ঞাতবাস

মানুষের সূক্ষ্ম চিন্তা-চেতনার একটা ঊর্দ্ধমুখী গতির কম্পন রেখাকেও। বলাই বাহুল্য যে 'Aristotle এর কোনো নির্দেশই আজ আর কার্যকারী নয়। মূলত তিনি aesthetic-এর লোক। বেকন তো ওঁকে প্রকৃতি বিজ্ঞানকে 'corrupt' করার দোষে দোষী করেছেন। এবং দু'হাজার বছরের মানব ইতিহাসের অন্ধকার যুগের দায় ওঁর ঘাড়ে চাপিয়েছেন। Plato-ও হাস্যকর হয়েছেন। Plato-র জন্যেই, পরবর্তীকালের বহু মণীষীকে দণ্ডভোগ করতে হয়েছে। প্রাণ দিতে হয়েছে। অথচ তাঁর গুরু সক্রেটেস—যুক্তিবিদ্যার আবিষ্কারক, তাঁর যুক্তি-বাদী মনের জন্যে এক অবিচারে মৃত্যুদণ্ড পান। কবিতার বয়স ইতিহাসের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে। প্রাণ স্পন্দনও। ইতিহাসের মতোই তার পরমায়ু বলে আমার ধারণা।

যাই হোক, শব্দ ও ভাষার ভিতরকার এত যে জটিলতা, যার সামান্যই হয়ত আমি স্পর্শ করতে পেরেছি রচনাটিতে—এর বেশি আমার চিন্তা আর চলে না—বিভ্রান্ত ও বিস্মিত হয়ে পড়ি। বিশুদ্ধ ভাব, বিশুদ্ধ ধ্যান বলতে আমি হয়ত কিছুই পরিষ্কার করতে পারিনি। তবু বস্তু, বা তজ্জাত নানান বস্তু-প্রতিক্রিয়া থেকেই আমাদের vision গড়ে ওঠে। একেই বলা যায় বাস্তবতা। যেমন সূর্য—একটা বস্তু, তার ও তার ধর্মের, চরিত্রের নানান প্রতিক্রিয়া জাত বস্তু সমূহের ধ্যান থেকে সূর্য সম্বন্ধে একটা vision তৈরী হয়। এই vision-ই কবিতায় বিমূর্ততা লাভ করে। এই বিমূর্ততাই কবিতার বিমূর্ততা। কিন্তু, আমাদের vision-এর গণ্ডগোলে একটা মানুষের সঙ্গে ছাগলের মাথা লাগিয়ে দিতে পারি এবং তার দুটি ডানাও থাকতে পারে এবং সে খুব সহজে উড়ে অন্য কোনো কল্পিত পৃথিবীতে যেতে পারে। কিন্তু আর যা-ই হোক, তাকে vision বলা যাবেনা। এবং তা ধ্যানও নয়। কিছু মানুষকে মজা দিলেও ভ্রান্তিবিলাস দিলেও তা কখনো কবিতা নয়। শিশুর কল্পনা বিলাসী মনের পক্ষে ব্যাপারগুলো স্বাদু হলেও প্রাপ্তবয়স্কদের একটু অসুবিধে হওয়া স্বাভাবিক। তাই যে ধ্যানের vision নেই, তা ধ্যানই নয়। উৎকল্পনা মাত্র। কবিতায় উৎকল্পনার ভাষা আমাদের বিরক্ত করে।

আমি খুব ভালোভাবে জানি যে ধ্বন্যালোক-লোচন বা Aristotle's Poetics' পড়ে কেউ কবিতা লেখেন না। কবিতার মতো স্বাধীনতা আর কিছুতে নেই। সর্বাধিক স্বাধীন শিল্প মাধ্যম কবিতা। তার ভাষার ওপরও কারো নিয়ন্ত্রণ থাকতে পারেনা। কবির কাছে সব শব্দই পবিত্র ও গ্রহণযোগ্য। তবু একটা নিয়ন্ত্রণ থাকে—ধ্যানে। এবং এ কারণে কবি মাত্রেই ধ্যানী। এবং সেই ধ্যান—অজিত শব্দ, ভাষা এক মায়া তৈরী করে—ঐ মায়ার বিকিরণই কবিতা। কিন্তু এ মায়া মিথ্যা মায়া নয়,—এই মায়া বস্তুর ধ্যান—বস্তু জগৎ-সঞ্জাত অভিজ্ঞতাগুলির সমন্বয়-ও তার এক একটি বিচ্ছুরণ, বিমূর্ত-বিচ্ছুরণ। ভাষা এর সামান্যই ধরতে পারে হয়ত। শব্দ অনেক সময় জঞ্জাল হয়ে উঠতে পারে হয়ত। ছন্দ / অলংকারের কথা বাদই দিলাম, ঐ গান-বাজনা—সাজ-সজ্জায় ধ্যানকে আরো নষ্ট করে দিতে পারে। শব্দই যেখানে কখনো কখনো ভারি, মোটা, কিম্বা পাৎলা, রুগ্ন, কিম্বা রঙিন বা ফ্যাকাশে হয়ে যায়—সেখানে অন্যান্য ব্যাপারগুলি আরো অকেজো হয়ে উঠতে পারে। ভাষাও। কেননা,

ভাষা গেলব বা মোটা, গিটকিরি-লাগানো বা উদাত্ত—এসব প্রশ্ন প্রশ্নই নয়—ভাষা ধ্যানের আভাস কতটা ধরতে পারল এটাই প্রশ্ন। ভাষা ও শব্দের ঐ বিশাল জটিলতার কথা আমরা জানি। কাজেই কবিতার ভাষা সহজ না জটিল হওয়া উচিত এ প্রসঙ্গে যাওয়ার আগে আমাদের এসব একটু ভাবতে হবেই।

এই অংশের গোড়াতেই সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ও অরুণ মিত্রের দুটি উদ্ধৃতি ব্যবহার করেছি। দুজনই শ্রদ্ধেয় কবি। আমরা কবিতা সম্বন্ধে নানাবিধ মতামত কবিদের কাছ থেকে পেয়েই বেশি খুশি হবো, স্বাভাবিক। সৃজনশীল মানুষের কথাই আমরা নানা কারণে মর্যাদা দিয়ে থাকি। ঐ উদ্ধৃতি আসলে দুই কবির দুই দৃষ্টিভঙ্গীকেই চিহ্নিত করছে। একজন কবিতায় অভিধান ঘেঁসা শব্দের দিকে ঝুঁকে বললেন 'দুগ্ধ পোষ্য শব্দের চেয়ে প্রাপ্তবয়স্ক শব্দই বেশি কর্মঠ'—একথার মানে কি তা আমার কাছে পরিষ্কার হলনা, কেবলমাত্র বোঝা গেল যে তাঁর অভিধান নির্ভরশীল শব্দের দিকে ঝোঁক আছে, তার সপক্ষে একটা দুর্বল যুক্তি দাঁড় করালেন তিনি। প্রতিটি শব্দই মানুষের বহু অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিশে মিশে প্রাপ্তবয়স্ক হয়েছে। প্রাপ্তবয়স্কতার সংজ্ঞা এরকমই হওয়া উচিত বলে আমি মনে করি। অভিধান মুখাপেক্ষী শব্দই যে প্রাপ্তবয়স্ক, তার সাহায্যে কাব্য-ভাষা গড়ে উঠলেই যে প্রাপ্তবয়স্ক ভাষা গড়ে উঠবে—এ একেবারে ব্যক্তিগত দৃষ্টিকোণের ব্যাপার। এ কখনো সাধারণ সত্য নয়। হয়ত এ মনোভাবেই শ্রেষ্ঠ লেখাগুলি লিখে ফেলা যায়। তাতে আমার আপত্তি নেই। আবার অরুণ মিত্র যখন চান ব্যবহারিক শব্দ, দেশজ শব্দ ব্যবহার করে তার কবিতার ভাষাকে গড়ে তুলতে, তখন সেটাও একটা দৃষ্টিভঙ্গী ছাড়া আর কিছু নয়। তিনি অবশ্য সুধীন্দ্রনাথ দত্তের মতো (শব্দ অভিধান মুখাপেক্ষী হওয়া উচিত কেননা দুগ্ধ পোষ্য শব্দের চেয়ে তা বেশি কর্মঠ) কোনো বেপরোয়া মন্তব্য করেন নি, তিনি বলেছেন, তাঁর কেবলমাত্র পছন্দের কথা। এই মনোভাবকে আমি Democratic মনে করি। হয়ত এমনোভাবেও শ্রেষ্ঠ কবিতাগুলি লিখে ফেলা যায়। এ ধরনের মনোভাবেও আমার বিন্দুমাত্র আপত্তি নেই। বিভিন্ন কবির বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী থাকতেই পারে, থাকাটাই স্বাভাবিক। তার আশ্রয় কোথায়, সেটাও ভাবতে হবে। সুধীন্দ্রনাথ দত্তের শ্রেষ্ঠ কবিতার ভূমিকায় বুদ্ধদেব বসু জানিয়েছেন, সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কাব্যে যে কিছু শব্দ আছে তা দুর্বোধ্য নয়, দুরূহ। দুর্বোধ্য ও দুরূহ এক কথা অবশ্যই নয়। দুরূহ শব্দ সাধারণ মানুষও অভিধান ঘেঁটে জেনে নিতে পারেন, ও সেই শব্দজাত অপরিহার্য ব্যঞ্জনাটি উপভোগ করতে পারেন। এবং কবিতার পাঠক একটু দীক্ষিত হওয়ার কথাও সুধীন্দ্রনাথ বলেছেন। আমরা জানি দুর্বোধ্য শব্দ বলে প্রকৃতই কোনো শব্দ নেই। দুরূহ শব্দই দুর্বোধ্য মনে হয় কখনো কখনো। শব্দ দুর্বোধ্য হলে তার কোনো ক্ষমতাই থাকে না—যেমন 'হিং টিং ছট'। কাজেই দুর্বোধ্যতার প্রশ্নই আসে না। আসে দুরূহতার প্রশ্নই। এই দুরূহতা যে নিন্দনীয়, তা নয়। নিন্দনীয় তখনই যখন, ঐ শব্দ কবিতায় থাকা কবিতার প্রয়োজনে অপরিহার্য নয় বলে মনে হয়। আবার দেশজ শব্দ, ব্যবহারিক শব্দই কবিতায় থেকে কবিতার ভাষাকে গড়ে তুলুক—এরকম মন্তব্যও বা উচিতার্থতা চাপিয়ে

দেওয়াও নিন্দনীয়।—এটা দৃষ্টিভঙ্গীর ব্যাপার। আমরা Bureaucracy চাইব না Democracy চাইব—এরকম এক নীতি-গত দৃষ্টিভঙ্গীর ব্যাপার। কবিতা হয়ে ওঠার সর্তের ব্যাপার নয়। স্বভাবতই প্রশ্ন উঠবে—এই দৃষ্টিভঙ্গীর—এই নীতিগত দৃষ্টিভঙ্গীর প্রসঙ্গটা কেন কবিতায় আসবে। দুটি উদাহরণ আমি ব্যবহার করব। (১) Aristotle তার Poetics-এ—tragedy-তে নারী, দাস ও অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষকে নায়ক বা নায়কোচিত চরিত্রে স্থান দিতে পই পই করে নিষেধ করে-ছিলেন। আমাদের নাটকেও উচ্চবংশীয় সুপুরুষকেই নায়ক হবার যোগ্য মনে করা হয়েছে। আজ একথা কি হাস্যকর নয়? আমরা ভাবি সবাই নায়ক হওয়ার উপযুক্ত। (২) মিশরের চিত্রে নাকি এমন ছবিই সর্বদা দেখা গেছে যেখানে কৃষকেরা শ্রমিকেরা শ্রমে কাতর হয়ে ধুঁকছে এবং রাজপুরুষ-প্রভুরা তা দেখে শান্তি পাচ্ছেন। এসব চিত্রের মোটিফের সঙ্গে ভ্যানগখ বা গঁগার (যার দু'চারটে মাত্র আমি দেখেছি) ছবির তুলনা করুন। বা অভিবাদনরত loyal রাজ সৈনিকের বদলে, বার্নার্ড শ'র Arms and the Man-এর আইরিশ সৈনিকটির তুলনা করুন। বুরোক্র্যাসি কি করে? আমার যতদূর ধারণা তা দূরত্ব তৈরী করে। Bureau= Writing Desk, Bureaucracy=Govt. by Official. আমি ডিকশনারি থেকে শব্দটির আভিধানিক অর্থ কী, সেটা দেখে নিলাম। বলাই বাহুল্য বুরোক্র্যাসি বাইরে থেকে সত্যি সত্যিই ভালো করে বোঝা মুশকিল। বুরোক্র্যাসি এমনভাবে চাপানো থাকে যে একটি জাতির সমস্ত সত্তা, তার উৎপাদন পদ্ধতি, বাজার, ব্যবসা, সে আড়াল থেকে নিয়ন্ত্রণ করে। এবং তথাকথিত Democracy-এর মধ্যেই তার সবচেয়ে আরাম হয়। এমনকি এটা অন্যভাবে সমাজতান্ত্রিক দেশের সর্বহারাশ্রেণীর একনায়কত্বের মধ্যেও দেখা দিতে পারে। আর তা মারাত্মকও হয়ে উঠতে পারে বলে আমার ধারণা। যখনই রাষ্ট্র একটা প্রতিষ্ঠান হয়ে ওঠে আর মন্ত্রী পরিষদের দপ্তরগুলির নিয়ন্ত্রণ-দায়িত্ব যখনই official-দের কব্জায় চলে যায়—তখনই তা Govt. by official হয়ে ওঠে। কিন্তু কি ভাবে একজন কবিও Bureaucra-tic হয়ে উঠতে পারেন? আমার ধারণা যে আধুনিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার Super structure-কে নিয়ন্ত্রণ করার বা তার নিয়ম-নীতিকে বিন্দুমাত্র প্রভাবিত করার ক্ষমতা একজন কবির নেই। সুপ্রাচীনকালে চীনের শাসনব্যবস্থার উঁচু পদগুলিতে নাকি কবিদের নিয়োগ করা হত। কেন? তারা নাকি খুব Sensative লোক হন। আমাদের দেশের রাজ দরবারেও সভাকবির স্থান ছিল বেশ সুমর্যাদার। তাঁরা ছিলেন সভারত্ন। তখন কবিরা Super-structure-কে হয়ত বা কিছুটা নিয়ন্ত্রণ করতেন। একটা পরোক্ষ প্রভাব নানাভাবেই থাকত। কিন্তু আধুনিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় সে জায়গা কবিদের নেই। আমরা জানি, Democracy-র প্রধান ভর Bureaucracy। এবং প্রকৃত Democracy কাকে বলে তার স্বাদ আমরা পাইনি। এর মধ্যে কি ভাবে একজন কবি Bureaucracy-র সঙ্গে জড়িয়ে পড়বেন? কিম্বা আরো অন্যভাবে বলা চলে, রাষ্ট্র ব্যবস্থায়, সমাজে Bureaucracy থাকতে কি ভাবে Democratic ধ্যান-ধ্যারণার সঙ্গে যুক্ত হতে পারেন। কিম্বা

আরো অন্যভাবে বলা চলে, একজন কবির মধ্যে Bureaucratic বা Democratic দৃষ্টিভঙ্গীর যাই থাকুক না কেন তা নিয়ে পাঠকের ভাববার কি আছে। পাঠক তো কবিতা পড়বেন মাত্র, ভালো লাগলে পড়বেন, না লাগলে পড়বেন না। একটু আগে যে দুটি উদাহরণ দিয়েছি, তা থেকেই এর উত্তরগুলির একটু আভাস অন্তত খুঁজে বের করা যায়। কোন সামন্ত প্রভুকে অভিবাদনরত সৈনিক বা কোনো ব্যারনেসের স্বল্পবাস দেহসুষমা শিল্প হিসেবে উৎকৃষ্ট হতেই পারে। এরকম ছবি যদি কেউ আঁকেন তা হলে কি অন্যায় হবে? মোটেও না। শিল্প হিসেবে তা আমাদের নান্দনিক সুখ দিতেই পারে। কিন্তু তবু আমরা ঐ শিল্প প্রবণতা এখন নাকচ করতেই চাইব। কারণ রুচিগত দিক ও নীতিগত দিক— উভয় দিক থেকেই আমরা তার উপযোগিতা হারিয়েছি। শিল্পীর ভিতরে একরকম Sense of morality কাজ করতেই পারে। এই morality-র সংবেদন থেকে আমরা বুঝলেও বুঝতে পারি যে আভিধানিক শব্দের প্রতি ঝোঁক, কবিতার ভাষায় আভিধানিক শব্দের পিঠ-উঁচু চেহারা একরকম স্বাভাবিক দূরত্ব তৈরী করেছে। স্বেচ্ছাকৃতভাবে কবি হয়ত তা চাননি, কিন্তু তা হয়ে উঠেছে। কিম্বা তিনি চেয়েছেনই যে 'দেশজ' অতিপ্রচল শব্দগুলি দুষ্কপোষ্য—ওগুলো বর্জন করাই ভালো এবং দীক্ষিত পাঠকই যখন কবিতা পড়বেন, তখন অভিধান মুখাপেক্ষী শব্দই (পরিণত বা প্রাপ্তবয়স্ক শব্দ!) কবিতার ভাষার বাহন হওয়া উচিত। এটা একরকম চেষ্টাকৃতভাবেই দূরত্ব তৈরী করার ব্যাপার বলে মনে হওয়া স্বাভাবিক। এই দূরত্ব তৈরীর প্রবণতাকেই আমি Bureaucratic মনোভাব বলতে চাই। যদি স্বেচ্ছাকৃতভাবে না চান, তাহলেও যদি আভিধানিক শব্দের আধিক্য কবিতার ভাষায় ফুটে ওঠে, তো তাকে অপরিহার্যতার দিক থেকে আমরা বিচার করে দেখতে পারি, এবং সে ভাষা আমাদের ভালো লাগুক না লাগুক, ভাবতে পারি যে তার মধ্যে Bureaucratic প্রবণতা নাও থাকতে পারে। Democratic নয় হয়ত কিন্তু Bureaucratic-ও নয়। অর্থাৎ কবিতার ভাষার ব্যাপারে তাঁকে নিরপেক্ষ কবি হিসেবে মেনে নিতে পারি। বলাই বাহুল্য যে Bureaucratic প্রবণতা সর্বদাই দূরত্ব তৈরী করতে চায়। ঠিক অন্যভাবে, Democratic মনোভাব স্বভাবতই প্রসারিত হতে চায়। রাষ্ট্র কাঠামোতে Bureaucracy থাকলেও ব্যক্তি ও সমাজ মনে Democratic মনোভাব থাকতেই পারে। এবং থাকাটাই স্বাভাবিক। কোনো সামাজিক মানুষই Bureaucracy পছন্দ করেন না। কেবলমাত্র Bureaucrat-রাই Bureaucracy পছন্দ করেন। এখন Bureaucrat কেবলমাত্র কিছু official-ই নয়—যন্ত্রও। এভাবে দেখলে রোবটও ব্যুরোক্র্যাট। এখন সি. আই. এ বা কে. জি. বি বা র বা ঐ জাতীয় সংস্থাগুলিই আবার ব্যুরোক্র্যাটের মাস্টার, গাইড। এবং এর এক নিপুণ বিন্যাস সমাজের সর্বত্র থাকতে পারে। নানা form-এ থাকতে পারে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সিলেবাসের মধ্যে তো আছেই। যে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আমাদের মাথা তৈরী হয় তার মধ্যে Bureaucracy-র অস্তিত্ব থাকে। বস্তুত এভাবে দেখলে পৃথিবীর অমূল

এখন Bureaucracy। ব্যুরোক্র্যাসি ভয় সৃষ্টি করে ও দূরত্ব তৈরী করতে চায়। Bureaucracy—Technology ও Planning-এর ওপর প্রভুত্ব সৃষ্টি করে। State Technology ও State Planning-এর ওপর তার প্রভুত্ব সীমাহীন। বহুদলীয় গণতন্ত্রে মন্ত্রী বদল, মন্ত্রী পরিষদ বদল হয়ই। মন্ত্রীরা Bureaucrat ছাড়া এক পাও চলতে পারেন না। এসব আমরা জানি। Jhon Keneth Golbraith তাঁর New Industrial state-এ এ বিষয়েও কিছু আলোকপাত করেছেন, তবে তা মূলত Industrial state-গুলি অর্থাৎ ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। সে সব দেশের রাষ্ট্রীয় কাঠামোতে বিশাল বিশাল Industrial organisation-গুলির মধ্যেকার ব্যুরোক্র্যাসি ও রাষ্ট্রের কাঠামোর মধ্যেকার Bureaucracy-তে কোনো ফারাক নেই। যাই হোক, আমাদের বর্তমান পৃথিবীর এই অসুখটি হয়ত আমাদের চেনা অসুখই, তবু, আমরা কম বেশি এ বিষয়ে উদাসীন থাকি। হয়ত বা থাকতে বাধ্য হই। কিন্তু আমরা বুঝতে পারি যে Bureaucracy-র ঝোঁকই হল দূরত্ব তৈরী করা, ভয় সৃষ্টি করা, Technology ও Planning-এর ওপর প্রভুত্ব করা। এ ধরনের মানসিকতা কবিদের মধ্যেও এসে যেতে পারে অন্যভাবে। এ ধরনের মানসিকতার ঝোঁক সৃষ্টির দিকে ব্যক্তি-বিশেষ থেকে রাষ্ট্র কাঠামোর ভিতর পর্যন্ত Bureaucrat-দের প্রবণতা সূক্ষ্মভাবে সর্বদাই ক্রিয়াশীল থাকে। এই প্রবণতা সমাজজীবনের বিরুদ্ধে এক অহংকার। এখন রুচিগত ও নীতিগত দিক থেকে মানুষ এটা কি ভাবে গ্রহণ করবে সেটাই প্রশ্ন। কবিদের মধ্যেও এই Bureaucratic অহংকার এসে যেতে পারে। ভাবে, ভাষায় দূরত্ব সৃষ্টি করা, ভয় সৃষ্টি করা এবং কবিতার Planning-Technology-র ওপর প্রভুত্ব সৃষ্টি করার ঝোঁকই কবির নিজস্ব কায়দার Bureaucracy বলে আমার মনে হয়। এই ব্যুরোক্র্যাসি বিমূর্ত রূপে রাষ্ট্রীয় ব্যুরোক্র্যাসি, Organisational Bureaucracy-র সঙ্গে যুক্ত থাকে। রুচি ও নীতির দিক থেকে মানুষ যদি এই দৃষ্টিভঙ্গী মেনে নেয়, কবিতায়, তাহলে আমার বলার কিছু নেই। কিন্তু আমার ধারণা ঐ Bureaucratic অহংকার—যা দূরত্ব তৈরী করে, যা ভয় সৃষ্টি করে, যা Planning ও Technology-র ওপর প্রভুত্বশালী—এবং যা উৎপাদন, মূল্য, বাজার, মুনাফার একমাত্র নির্দ্ধারক শক্তি হয়ে ওঠে (Jhon Keneth Golbraith —The New Industrial state স্মরণীয়)—তখন সমাজের সঙ্গে ঐ অহংকারের দ্বন্দ্ব তৈরী হওয়াও স্বাভাবিক। এবং Bureaucracy যেমন আছে তার সঙ্গে গণতান্ত্রিক মনোভাবের দ্বন্দ্বও আছে। গণতান্ত্রিক মনোভাব বললাম এই জন্যে যে কবি হিসেবে ঐ ব্যবস্থা হল আমার কল্পিত সুখের জায়গা। সত্যি কথা বলতে কি, সমাজে নানাভাবে emotional জীবনে আমি ঐ Bureaucracy-র দ্বারা নিগৃহীত হয়েছি। আমার মতো অনেকেই যা হয়ে থাকেন। আমাদের দেশের Bureaucracy অবশ্যই আধুনিক যে কোনো Industrial state-এর Bureaucracy-র মতো সূক্ষ্ম ও সপ্রতিভ নয়, তার ওপর Feudal মরচে আছে। কলোনীয়াল ধোঁয়া আছে। তবু, আমাদের রাষ্ট্র কাঠামোতেও Bureaucracy-র

একটা ভোঁতা অবস্থানই ক্রমাগত সপ্রতিভ করে গড়ে তোলার চেষ্টা চলছে। এবং তার সঙ্গে দ্বন্দ্বে গণতান্ত্রিক মনোভাব প্রতিবাদী ভূমিকা নেবেই। কবিতায় এই দ্বন্দ্ব—মূলত বিষয়ের দ্বন্দ্ব। আগেই বলেছি যে বিষয়ই মুখ্য—যে কারণে কবিতার structural দিকের যে কোনো আলোচনার বিষয় এসে পড়বেই। যাই হোক আমাদের প্রসঙ্গ ছিল শব্দ। শব্দের একটা elementary শক্তি আছে, যা infect করে। শব্দের ভিতরকার ঐ শক্তিকে কি বলব, জীবাণু, যা শব্দ থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। সমসাময়িক দুই পরিচিত কবির দুটি কাব্য-পংক্তি থেকে দুটি শব্দ বেছে নিয়ে এর খানিকটা আন্দাজ দেওয়া যেতে পারে। রণজিৎ দাশের 'গ্যারেজ' নামক একটা কবিতা পড়েছি যেখানে তিনি 'এক খাবলা' ধুলোতে সে মুছেছিল হাতের মবিল' লিখেছেন—ধরা যাক ঐ 'খাবলা' শব্দটিই। 'মুঠো' যে ভাবে infect করত তার চেয়ে অনেক বেশি পরিমাণেই যেন infect করল ঐ 'খাবলা' শব্দটি। কেননা—প্রসঙ্গ এক শ্রমিক ধুলোতে হাতের মবিল মুছছে—এর অনুষঙ্গে, ঐ ছবি-তরঙ্গের সঙ্গে, ভাবানুভূতির সঙ্গে 'খাবলা' শব্দটিই বেশি infect করার শক্তি ধরে। যে জীবাণু অবিচ্ছেদ্যভাবে শব্দে থাকে তাকে হয়ত কোনো কবিই (অবশ্য মালার্মের কথাটি আমার স্মরণেই আছে) আগে থেকে ভেবে চিন্তে বের করতে পারেন না, তা থাকে তাঁর স্বভাবে, রুচিতে, বোধে, vision-এ। সে ভাবেই তা উঠে আসে। কবিরা সম্ভবত শব্দ লেখেন না, idea লেখেন। আর একটি কবিতা, নির্মল হালদারের 'দ্রৌপদী' থেকে দুটি পংক্তি নেওয়া যাক 'আমার শাড়ী ছিঁড়ে গেছে শরীর ছিঁড়ে নাই / ও জল আমাকে রক্ষা করো।' 'রক্ষা' এখানে অসম্ভব ভাবে infect করল। প্রসঙ্গ এক বাঙালী দরিদ্র গৃহবধূ, ঘরে ছেলে আছে, ছেলের বাপ আছে, কিন্তু তার আব্রুর অভাব। নদীর জল স্নানের সময় সেই ছেঁড়া আব্রুও স্রোতের টানে কেড়ে নিতে চায়। তাই ঐ ব্যাকুল শব্দ দুটি 'রক্ষা করো।' যেন দ্রৌপদী কৃষ্ণকে বলছেন। এভাবেই শব্দের elementary জীবাণু, অনুভূতি, চেতনাকে infect করে। আবার আমি শ্রদ্ধেয় কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্তের 'ক্রন্দসী' কাব্য গ্রন্থের 'প্রতিবাদ' কবিতাটির কয়েক পংক্তি পড়তে পড়তে এড়িয়ে গেলাম, আমি হয়ত দীক্ষিত পাঠক নই, প্রতিবাদ-এর এই অংশ 'চিত্রাপিত মুকুরের তলে / দিগন্তের যুগ্ম গিরি শোথসান্দ্র পীবরতা পায় / সূচ্যগ্র অনিমা টুটে"—দুটি শব্দ—'শোথসান্দ্র' ও পীবরতার মধ্যে কি আর elementary জীবাণু কিছু নেই? নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু, আমার হাতের কাছে ডিকশনারি না থাকায় আমি দুঃখিত এই কারণে যে, ওর মানে, ঠিক ঠিক অর্থটা ধরতে পারলাম না। এরকম শব্দের জীবাণু বড় অভিমানী, অসূর্যম্পশ্যা, কিম্বা অভিজাত, চিকের আড়ালে সম্ভ্রম রক্ষায় ব্যস্ত, অথবা দামী শাল, কোনো অনুষ্ঠানেই কেবল মধ্যবিত্তরা ব্যবহার করে থাকেন, কিম্বা ফ্রিজ, গরীবরা যার ব্যবহার জানেন না। ঐ শব্দদুটির প্রতি আমার কোনো অভিযোগ নেই। এমনকি কবিতায় ব্যবহৃত হয়েও সে কোনো অপরাধ করেনি। আমার শুধু বক্তব্য এই যে, ঐ দুরূহ শব্দ দুটি ব্যবহৃত জীবনের অভিজ্ঞতায় মোটেও উজ্জ্বল নয়। এবং এ কারণেই তার সংক্রমণ শক্তিও কম। কেবল কিছু দীক্ষিত

পাঠক, যাঁরা প্রয়োজন হলে হাতের কাছে ডিকশনারিও রাখবেন ব্যবহার করার জন্যে—বেছে বেছে কেবল তাঁদেরই ঐ শব্দ infect করবে? ব্যাপারটা হলো দৃষ্টিভঙ্গীর বা approach-এর। কাছে টানব না দূরে ঠেলব এই ব্যাপার। সবাই কবিতার পাঠক নয়। নয় বলেই তাদের দূরে ঠেলব, না কাছে টানব এই দ্বন্দ্ব—কাউকে দূরে ঠেলতে অনুপ্রাণিত করে, কাউকে কাছে টানতে অনুপ্রাণিত করে। দূরে ঠেলার অনুপ্রেরণাকে আমি Bureaucratic অনুপ্রেরণা মনে করি। কাছে টানার অনুপ্রেরণাকে আমি Democratic অনুপ্রেরণা বলে মনে করি। সবাই আমার সঙ্গে একমত না হলেও, আমার মতটাকে আমি স্পষ্টভাবে জানালাম। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত যে সর্বদা এই ভাষায় কবিতা লিখতেন, তা নয়। উদাহরণ হিসেবে ওঁর কবিতা থেকে পংক্তি নেওয়ার কারণ হল, ওঁর একটি বিশিষ্ট মতামত, যা আমি আগেই উদ্ধৃত করেছি। আবার আমরা সুধীন্দ্রনাথ দত্তের ১১ই মে ১৯৩৯-এ লেখা 'কাস্তে' কবিতার দু'টি পংক্তিও পড়েছি 'আকাশে উঠেছে কাস্তের মতো চাঁদ / এ যুগের চাঁদ কাস্তে'। ঐ চাঁদ ও কাস্তে শব্দদুটি পরবর্তী কালের কবিদেরও infect করেছে খুব মৌলিক বোধের জায়গায়। পাঠকদেরও করেছে। 'এ যুগের চাঁদ কাস্তে'—একথা উনিই প্রথমে বলতে পেরেছেন—যুগ ধর্মের দিকে প্রাজ্ঞ নজর রেখেই। পরের দুটি পংক্তিও পাশাপাশি এসে গেছে এইভাবে 'ছায়াপথে কোনো অশরীরী উন্মাদ / লুকাল আসতে আসতে।' পরের দু'টি পংক্তি একটু বাড়াবাড়ি হয়ে গেল—Comitment-এর অতি উৎসাহে। নানা দ্বন্দ্বে জর্জরিত সুধীন্দ্রনাথের মানসিকতার এও এক দ্বন্দ্ব। রবীন্দ্রনাথের গ্রাস থেকে উদ্ধার পাওয়ার দ্বন্দ্ব, আধুনিক নৈরাত্ম্যবাদী হওয়ার দ্বন্দ্ব, এবং তার সঙ্গে Bureaucracy ও Democracy-র চেতনাগত দ্বন্দ্ব। এসব নিয়ে সুধীন্দ্রনাথ দত্ত বেশ চার্মিংও বটেন।

আমরা জানি যে কোনো কিছুই প্রকট হয়ে ওঠা খারাপ—ছন্দ/অলংকার, আঙ্গিক, শব্দ ভাষা। আমরা জানি যে সব সময়ই এদের বিবর্তন হচ্ছে। আমরা এও জানি যে, আদি উৎসে শব্দ ছিল সংকেত, ভাষা ইন্দ্রজাল রচনা করত বা ভাষাও ছিল সংকেত। আমরা কবিতার ভাষার, শব্দের কিছুটা উচ্চতার কথাও জানি—যা অন্যান্য ভাষা থেকে একটু উঁচু হতেই পারে। কিন্তু এসবের Synthetic Generalization-ই কেবল আমাদের অনুভূতিকে অনুপ্রাণিত করতে পারে। এক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি খারাপ। প্রচলিত শব্দেই কবিতা রচিত হওয়া উচিত, অভিধানের শব্দ পরিত্যাগ করা উচিত—এরকম কথা বস্তুত আর এক ধরনের Bureucracy-র দিকে নিয়ে যায়—যাকে বলে functionalism। যদি বলি Bureaucracy চাই না, Democracy চাই—তার মানে এই নয় যে আমরা functionalism চাই। একজন কবির একটি সৃজনশীল ব্যক্তিত্ব থাকে, তার ভিতর দিয়ে সব কিছু হয়ে ওঠে। সামাজিক দিক থেকে Bureaucracy-র মধ্যে থেকেও, তার দাসত্ব করেও, তার মধ্যে একটা 'গণতান্ত্রিক মনোভাব' থাকতে পারে। সমগ্র রচনায় সেই মনোভাব ফুটিয়ে তোলার জন্যে কেবল শব্দই ভরসা—একথা ঠিক তো নয়ই—বরং ক্ষতিকারক। দূরে ঠেলব না, কাছে টানব—তার মানে এই নয় যে আমরা

Aesthetic up bringing-এর কথা ভুলে যাবো। ক্ষতকাতরতা, পীড়নের মধ্যে কোনো Aesthetic up-bringing হয় না, জেনেও আমরা সেই চেষ্টাই করব। তা যদি না করি, তাহলে, কবিতা ছেড়ে দিয়ে এখন অন্য কিছু করা উচিত ছিল আমাদের। এই Aesthetic up-bringing মানেও এই নয় যে আমরা দূরে ঠেলে দেওয়ার পথটাই বেছে নেব। আমরা জানি যে পৃথিবীতে এখন গণতন্ত্র নেই, ফরাসী বিপ্লবের সময় যাঁরা equity, fraternity, liberty-এর ধ্বনি তুলেছিলেন, তাঁরাই সত্যিকারের গণতন্ত্রের মধ্যে তাঁদের 'ভয়' দেখেছিলেন। Wealth ধীরে ধীরে Capital হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে যাঁরা Wealthy অর্থাৎ Feudal Lords তাঁদের মূল্যবোধের সঙ্গে যাঁরা Capitalist তাঁদের মূল্যবোধের সংঘাতেই গণতন্ত্র শব্দটির উদ্ভব। ফরাসী বিপ্লবের ব্যর্থতার মধ্যে দিয়ে প্রমাণ হল গণতন্ত্রও ধ্বংস হল। ঐ মোহসৃষ্টিকারী তিনটি শব্দের মধ্যে যে Capitalist-দের মুনাফা গড়ে দেওয়ার শ্রমিকদের আশা-আকাঙ্ক্ষাও প্রতিধ্বনিত হতে পারে এবং তা বেশ জোরালো হতে পারে, তা মাত্র ক'দিনেই বোঝা গেল। প্যারী কম্যুনে ধ্বস নামল। এবং গণতন্ত্রও উঁকি দিয়ে আবার আড়ালে চলে গেল। কিন্তু, মানুষের আকাঙ্ক্ষার একটা মাত্রা বাড়িয়ে দিয়ে গেল, আমি ঠিক জানিনা পৃথিবীতে গণতন্ত্র কোথাও আছে কিনা এবং ভবিষ্যতেও তা থাকবে কিনা, কিন্তু এ আকাঙ্ক্ষার জোর কমবে বলে তো মনে হয় না। নানা বিষয়ে, নানা দিকে এ আকাঙ্ক্ষার স্ফুরণ ঘটবে। আসলে এটাই হল দৃষ্টিভঙ্গীর ব্যাপার। গণতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গীর ব্যাপার, এবং এটাই হল up bring-এর ব্যাপারও। কবিতার ভাষায় সেটা কিভাবে আসে তাই দেখার ব্যাপার। 'দুরূহ' বা 'সুবোধ্য' আসলে শেষ পর্যন্ত আসল ব্যাপার থাকে না। এবং শব্দই একমাত্র কবিতাকে সুবোধ্য ও / অথবা গণতান্ত্রিক করে দিতে পারে না। তার পিছনের Motif-টাই সত্যিকারের ব্যাপার।

সমসাময়িক দুই কবির যে দুটি শব্দ আমি ব্যবহার করেছি—শব্দের elementary force টাকে দেখানোর জন্যে—তা দৈনন্দিন ও সর্বজন ব্যবহৃত শব্দ। তবু তার শক্তি কত ; কতটা হতে পারে একটা কবিতার মধ্যে, সেটাই দেখার বিষয়।

বরং আমি মনে করি মৌখিক, দৈনন্দিন, অতিপ্রচল সাধারণ শব্দে গড়া ভাষায় কবিতা লিখতে যাওয়ার ঝুঁকি অনেক। না ভেবে-চিন্তে এরকম ঝুঁকি না নেওয়াই ভালো। এতে খেলো, বস্তাপচা, দুর্বল, অগভীর পদ্যের ঝাঁক বেরিয়ে আসতে পারে। বরং আমি মনে করি গদ্য আঙ্গিকে ব্যবহারিক জীবনের ভাষার প্রশ্রয়ে তথাকথিত ঐ গণতান্ত্রিক মেজাজ ফুটিয়ে তোলার ঝুঁকি অনেক। সব সময়ই পাঠকের বিতৃষ্ণা জুটে যেতে পারে কপালে। এ চেষ্টা চল্লিশের দশক থেকেই শুরু হয়েছে, কিম্বা তাঁর আগে থেকেই। এটা কখনো কখনো একটা আধুনিক-কৌশল হিসেবে, শুধুমাত্র কৌশল হিসেবেই গ্রহণ করা হয়েছে আমাদের দেশে। কখনো খুব ভালো করে দেখা হয়নি কেন এটা 'Temper of the Age' হয়ে উঠবে। অরুণ মিত্র বেশ আক্ষেপ করে এরকম বলেছেন—বিদেশে যা ঘটে আমাদের দেশে

([redacted])

তা অনেক পরে আসে। কেননা আমাদের দেশটা ফ্রান্স/ইউরোপ থেকে পিছিয়ে আছে। কথাটা খুবই সত্যি। বিদেশ থেকে শুধু কিছু ওপর ওপর শিক্ষা নিলেই শিল্পের-উপকার হয়না। তাকে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে নেওয়ার দরকার আছে। বিদেশ থেকে আমাদের অনেক কিছুই নিতে হয়েছে ও হবে। আমরা জানিনা বিদেশে এই মুহূর্তে কোথায় কি সাহিত্য আন্দোলন গড়ে উঠল এবং তা থেকে আমাদের সত্যিই কিছু শিক্ষা নেওয়ার আছে কিনা। হুইটম্যানের প্রতি রবীন্দ্রনাথ খুবই আকৃষ্ট হয়েছিলেন যে তা এমনিতে নয়। শুধুমাত্র কৌশল-প্রিয় হয়ে নন। বর্তমান সময়ের সবচেয়ে সেরা বুর্জোয়াটিক দেশের প্রথম প্রধান কবি Walt Whitmanই সেই ১৮৫৫ সালে বলেছিলেন have patience and indulgence toward the people'. তাঁর ব্যক্তিগত জীবন পর্যালোচনা করলে বোঝা যাবে, এবং তার কাব্য থেকে উদ্ধার করা যাবে—এ কোনো কৌশলী শ্লোগান নয়। তাঁর প্রতি অনেক নিন্দা এবং অপবাদ বর্ষিত হয়েছে, বেপরোয়াভাবে উদাত্তকণ্ঠে বিশাল এক মানবতাবোধে অনুপ্রাণিত হয়ে কবিতা লেখার জন্যে। তিনি সে সব নাকচ করে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন "The messages of great poets to each man and woman are, come to us on equal terms···what we enjoy you may enjoy"—এই উদাত্ততা কোনো কিছুই গ্রাহ্য করেনা। Aristotle poetics-কে না, ধ্বন্যালোক লোচনকেও না। আমরা কি আমাদের দেশের ক্ষেত্রেও, ব্যবহারিক শব্দ / ভাষা ও গদ্যছন্দ temper of the age বলে মনে করি? এও এক ঝুঁকির ব্যাপার। যে দেশের কাল পয়ার আর ললিত / পদ্যগন্ধী শব্দের মতো করে তৈরী হয়ে আছে, কাছে টানার জন্যে ঐ পয়ার ও ললিত / পদ্যগন্ধী শব্দের দাবীও কম নেই। এসব নানা দিক বিচার করে দেখলে আমার তো মনে হয়, ব্যবহারিক ভাষা ও গদ্য কাঠামোতে কবিতা লেখার চেষ্টা বেশ দুঃসাহসের। এদেশে। চল্লিশ দশকের অনেক কবিই ঝুলেছেন। পঞ্চাশের ঝোঁক ভাঙা-পয়ারে আবদ্ধ থেকে গেল। তারাও ঐ পয়ারের তান মাখিয়ে বহু ব্যবহারিক শব্দকেই পদ্য-গন্ধী করে ফেলেছেন। ঐ ভাঙা পয়ার ও তান মেশানো ব্যবহারিক শব্দও cliche হয়ে উঠেছে—ভাঙা রেকর্ডের মতো। তবু, তা বাঙালী পাঠক নিয়েছে। কিন্তু সমর সেন বা অরুণ মিত্র? এঁদের ব্যাপারে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে। এরা সার্থকভাবে দুটি ব্যাপারকেই কবিতায় এনেছেন। কিন্তু আমার বিশ্বাস খুব বেশি কৌতূহলী পাঠক ছাড়া এঁদের প্রতি আকৃষ্ট পাঠক আমি বড় বেশি দেখিনি। তা হলে? তাই, আবার ঘরে ফেরা, আবার পয়ার ও কবিতা বলে চিহ্নিত করা যায় এমন ভাষা প্রবণতা আমাদের 'Temper of the age' হয়ে উঠেছে। এর সঙ্গে ফিউড্যালিজম্-এর কোনো সম্পর্ক আছে কি? আমি জানি না।

আমারই Democratic হওয়ার যুক্তি জালকে আমিই নস্যাৎ করে দিয়ে বলতে বাধ্য হচ্ছি যে খাঁটি গদ্য কাঠামোতে দৈনন্দিন ব্যবহারিক শব্দে কবিতা লিখতে যাওয়া অনেক অনেক বেশি ঝুঁকির ব্যাপার। এখন, এদেশে। সংস্কার

জিনিষটা আরো গভীর জিনিষ, কবিতার চেয়েও। তবু, সে চেষ্টাও হতে দেখছি। ঝুঁকি নিয়েও চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন কেউ কেউ। শুধু হৃদয়াবেগ নয়, গূঢ় অনুভব। গূঢ় অনুভবের চাপা স্বভাবকে ব্যবহারিক ভাষায় আনতে পারা এক দুর্লভ ব্যাপার। সে নাচাবে না, সে গাওয়াবে না, সে চমকেও দেবে না রূপ আর রং-এ। হৃদয় থেকে, অনুভূতি থেকে এক শান্ত দ্যুতির মতো সে তির তির করে ছড়িয়ে পড়বে, পরিবেশে, জগতে।

২৫শে বৈশাখ অজ্ঞাতবাস-এর
আত্মপ্রকাশে
আমরা সঙ্গত কারণেই ক্ষুব্ধ
এবং আনন্দিত।

সুবীর রায় সেনগুপ্ত ধীমান
কল্যাণ চক্রবর্তী (১)
কল্যাণ চক্রবর্তী (২)
রঞ্জিৎকুমার চন্দ
মহঃ ইসমাইল (সাহেব)

অনুরাধা মহাপাত্র

মুদ্রাজননী ১

কালীর আঙ্গিক আজ লুটোয় বন্যা ডোবা ডালে
উপনিবেশের শিল্প টাল খায় গয়নায়
কাঁধে তার কুঠারের রহস্যচক্র
স্বর্ণগোখরো খায় ওই খাজুরাহো
চলো হে ভূতের বেগার খাটা প্রেত
সজ্জিখোসা, ঋতুবিজ্ঞাপন আর পোস্টারের
পাশে আজ কালী, তাকে
দান ফেলে নিয়ে চলো গাঁজার আড্ডায়
তারপর ঘাসে ঘুম মৃগয়ায়।

মুদ্রাজননী ২

সমস্ত রেসের ঘোড়া চলে গেলে
শূন্য ঘাস হয় কালী, বাসের শেষ চাকা
সমুদ্রের দিকে ছুটে যায়, কিন্তু তার
মাথা মণ্ডপের পিছনে অন্ধকার
শুঁয়োপোকা জন্ম দিয়ে যায়
কালীর শাড়ীও আজ প্রজাপতি, স্বর্ণমুদ্রা প্রায়।

বাদুড়ের আত্মকাহিনী

আগুনে হাত দিয়ে ঝুপড়ির বাচ্চা বড় হয়ে যায়
নারীদের অগ্নিসংস্কারের দিন তারা
আকাশের দিকে লাফ দিয়ে উঠে ফের
বনভোজনের বালক হয়ে যায়
যে বালক মুষল হাতে আর যে বালক তীর হাতে
তারা দুজনেই নারীর প্রণাম চায়
তাদের শূন্যভেদী রাত্রি নেই
ভেড়ার লোমের উষ্ণীষ
ভেড়ার পায়ের ফাঁকে তাদের সরল মুখ নেই
তারা আজ কালো শ্লেটে নারী আঁকে
ডানা মুছে যায়
বাদুড়, তারাচিহ্ন, অল্পতাপলাগা জন্ম মনে পড়ে হায় !

অযোনিসম্ভব

মাথা নয়, আপাদমস্তক এই খচ্চরের দেশ
ট্যাঁকে গোঁজা নেশাদ্রব্য, তালপাখা, আশশ্যাওড়ার ঘর
পাশে দেখা যায় রেলব্রীজ, কালো ভিখারীর ছা
ঈশ্বর ও ছাগলের মুখ একই খোঁয়াড়ে
ঘাস, খড়, পেচ্ছাবতরঙ্গে
শহরতলীতে টেবিলল্যাম্পের সঙ্গে সামসাদ বেগমের গান
ধনেশপাখির খাঁচা নিয়ে আধুনিকতা এল
বিধবার ঝি, উলু দাও
বেজী রাখো তুমি কাপড়ের নীচে
তুমি গাছে তোলো অন্ধকার শাড়ী
ঢেঁকিতে পেড়ে ফ্যালো মাথা,
ল্যাম্প নেভাও কমাও
মাঝরাতে বের করে পড়ো বিশ্বমঙ্গল
ঘাস, খড়, পেচ্ছাবতরঙ্গে আজ অন্ধকার গাছ ভাসে
সঙ্গীতে নির্দুম মাথা কাকতাড়ুয়ার মত ভেসে যায়।

নীলকান্ত রায়

ক্রশিং পেরিয়ে যাচ্ছো

ভ্রূকুটি ভাঙ্গেনি ভঙ্গি, শুধু একা তুমি
ক্রশিং পেরিয়ে যাচ্ছো স্বচ্ছন্দ দু'পায়ে।
উড়ে যাচ্ছে রঙিন রুমাল,
উড়ে যাচ্ছে ভুবনমোহিনী খোলাচুল !
পথের মাঝখানে তুমি ক্রশিং পেরিয়ে যাচ্ছো—
নীলচটি—স্বচ্ছন্দ দু'পায়ে।

সবাই যে-যার মত পেয়ে গেছে হাল্কা ট্রাম—সবুজ সিগন্যাল—
সারসার সবুজ আলো জ্বলে উঠতে—অলৌকিক মন্ত্র ও মায়ায়—
ট্রাফিকের জট খুলে দুরদার ছিটকে যাচ্ছে ডিজেল ইঞ্জিন,
ময়দান পাশে রেখে ছুটে যায় ডবল ডেকার—
ছুটে যায় দিগন্তের কিছু কাছাকাছি।
অফুরন্ত হাওয়া ও অক্সিজেন খোলা জানালার ধারে শুষে নেয় ঘাম।
উড়ে যায় রঙিন রুমাল !

ঘাম ও ধুলোয় ঝাপসা তোমার শরীর বেয়ে আঁচলের নীচে
পবিত্র নদীর মত ভেসে ওঠে স্বচ্ছতোয়া বর্ণময় কেউ।
ভ্রূকুটি ভাঙ্গেনি ভঙ্গি, শুধু একা তুমি
ক্রশিং পেরিয়ে যাচ্ছো স্বচ্ছন্দ দু'পায়ে—স্থির—
ট্রাফিকের বেলেল্লা জঙ্গলে।

নারীও ফেরায় মুখ

নেইনি দু'হাতে স্পর্শ বহুদিন নদী ও নারীর।

আমার ব্যস্ততা নেই কোনো
আমার সমৃদ্ধি নেই কোনো ইদানিং আর।
বহুদিন পায়ে পায়ে ময়দান পার হয়ে সবুজ দেখিনি দুই চোখে।

একান্ন

নদীও ফেরায় মুখ দীর্ঘকাল অবহেলা পেয়ে—
বহুদিন পায়ে পায়ে নদীর কিনারে এসে
শরীর জুড়োতে
জলের শীতলস্পর্শ নেইনি দু'হাতে।
নেইনি দু'হাতে স্পর্শ বহুদিন নদী ও নারীর—
নারীও ফেরায় মুখ—

সমস্ত কলুষ ধরে আমি শুদ্ধ হ'তে চাই
সুবর্ণ নারীর কাছে আবক্ষ অবগাহনে, পাপে—
পাপে ও পতনে।

প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়

শেষ লণ্ঠ

শেষ লণ্ঠ ধরবার সফল উত্তেজনা থিতিয়ে পড়লেই
ঈষৎ আলোকমালা দেখা দেয়, দু তীরে শহর, আর
অন্ধকার গঙ্গাজল, ধর্মাধর্ম, শেষ লণ্ঠ, ওহে
ভীতি ও নিঃসঙ্গতাসহ আমাকে বহন করে নিয়ে যাচ্ছ
ভীতিনিঃসঙ্গতার ভেতরে অসম্ভব জেগে উঠছি
বছর তিনেক পরে পুনর্বার জেগে উঠছি
অতএব আজ, বুঝতে পারছি পিছুটান শব্দের মহিমা
ঘরে কি পোয়াতি বউ ? আলোকিত হাওড়া ব্রীজ
এবং ব্রীজের নীচে বিচ্ছুরিত অন্ধকার
গঙ্গাজল, ধর্মাধর্ম জেগে উঠছে
চতুর্ধারে, নিঃসঙ্গতা, তোমাকে দেখলাম আজ অপ্রবল গুহাচিত্র
বাথরুমসুরঙ্গপথে যেযেভাবে দেখা যায় রেলনুড়ি
যেযেভাবে দেখা যায় ফাঁকা লণ্ঠে
বছর তিনেক পরে দেখা যায়
সেইভাবে আজ দেখা হলো ; বলো, ভালো আছো

কমল চক্রবর্তী

অবেলায় মদ

যে প্রতিদিন অবেলায় মদের গেলাসগুলি রেখে যেত
আজ সে কলের গান হাতে গাছের আড়ালে লুকিয়ে রইল
চিলি-চিকেনের গন্ধে মাতাল পাড়া ফেরত বক বসেছে উঁচু ছাদের মাঝখানে
ঘুরিয়ে ফিরিয়ে আজ মদওয়ালার মেয়ের টাকে চুল গজাবার
রিস্ট নিয়ে কথা হবে
ভাতের হাঁড়ি থেকে যে সব যুদ্ধ ক্রমশ কাঁচের আড়ালে চলে যায়
ছিপির বাইরে পড়ে থাকে সেনাপতির গেলাস
কতকাল পর জলের কুঁজো বেয়ে ফের উঠেছে লাল কাঁকড়া
এখন খালি গেলাসের ধারে শুয়ে থাকবে
ক্যাথলিক নানের হাসিখুশি গুপ্ত প্রেমিক।

জল

জলে হাত দাও
জলের ধারে তুমি বাতাবীলেবু নিয়ে এসেছ
জলে ঘুরে দাঁড়াও
জলের পাশে তুমি চাবির গোছা হাতে দাঁড়িয়ে আছ।
জলে ধকল দিতে ব্যাণ্ডপার্টি সঙ্গে মুরুবি বাবুরা এসেছেন
জলে ভেসে গেল মুড়ি মিছরির দোকান
ভাসলো পেপারওয়েট কিছুকাল।
জলে বিকেলবেলার বন্দুক ধোয়া রং
জলে সকালবেলার চাবুক খাওয়ার শব্দ
জলে রাত যায়, শালে চৈত্রখেলা রাত
জলে সায়া শাড়ি গিঁটলাগা অন্তর্বাস ফেলে দিয়েছ
জলে ফেলতে পারলে পাঁউরুটির বাসি টুকরো ?
ফেলতে পারলে মুসুরির ডাল ?
ফেলতে পারলে বঁটি ?
জলে আদিবাসীরা তীর ধনুক ফেলে দিয়ে
ক্রমাগত নদীর খাড়ি বেয়ে নেমে যাচ্ছে।

তিপ্পান্ন

সমীরণ রায়

সমীরণের সঙ্গে কথোপকথন

—কোথায় চলেছো তুমি ?
—হাওয়ার গহন অন্তঃপুরে
—কিন্তু হাওয়ার মর্মধ্বনি তুমি বুঝেছো কি ?
—মৃদু এক তরঙ্গধ্বনি শুনতে পেয়েছি, তবে গান শুনতে পাইনি এখনো।
—তোমার নিবিড় যাত্রাপথের উদ্দেশ্য কি ?
—ধ্রুবসত্যের প্রকৃত রূপের অস্তিত্বে নিজেকে বিলীন ক'রে দেওয়া।
—কিন্তু সত্য সম্পর্কে কি নিটোল ধারণা হয়েছে তোমার ?
—না। শুধু বুঝেছি, আমি অগ্নিপুত্র, আর আত্মার নূপুরনিক্কনের শব্দ শুনেছি।
—কতোদূর যেতে পারবে তুমি ?
—জানি আমি জানি, চক্রের নিয়মে আমারও অস্তিত্ব ক্ষণস্থায়ী,
ফলে আমার নীলাভঅন্বেষাও ফুরিয়ে যাবে তাড়াতাড়ি,
তাই আমি সন্ধাতুর জীবের সঙ্গে আমার অগ্নিবলয় একাকার করে দিয়েছি।
—সত্যি ক'রে বলো তো, কোন্ নিগূঢ়ে চলেছো তুমি ?
—বিশ্বাস করো, হাওয়ার গহনে নিজেকে আবিষ্কার করতে।

সার্বিক

মালীরা বলছে, আর কোনো গাছ নেই
গাছ বানাবার কোনো পরিবেশই নেই
আমি বলছি, কিছু গাছ মারা গেছে ঠিক বালখিল্য হাওয়ায়
কিন্তু গাছের শিকড় চিরকাল নেমে থাকে মাটির গভীর তলায়।
আসলে আকাশ আজো নীল, সর্বদাই নীল
শুধু বদলে গেছে আকাশের আঙ্গিক
আর সঁপল অবিমৃষ্য বাতাসের স্পর্শে
অপরিণত পাখিদের স্নায়ুতরঙ্গ ভরে ওঠে স্রোতের কালোউজানে
তবুতো চাকার ঘূর্ণনে সবশেষে পথে পড়ে থাকে ধুলো,
মাটির গন্ধে উতরোল
যা-কিছু থাকবার—তা থেকে যায়
যা-কিছু মুছবার—তা মুছে যায়
চিরনক্ষত্র জ্বলতেই থাকে বহিরঙ্গে সংপৃক্ত অন্তর্মুখীন স্রোতে।

চন্দন মুখোপাধ্যায়

দিনযাপন

ওষুধের কাছাকাছি সারাদিন স্তব্ধ ব'সে থাকা
এছাড়া সারাটাদিন ঘামে ভেজা মুখ দেখে কেটে যায়
কখনো রাতের বেলা খণ্ড হ'য়ে ভেঙ্গে পড়ে নীল চাঁদ
কখনো সকাল বেলা মাংস-গাছ উঁকি দেয় এই ছোট ঘরে।

নিজেই নিজেকে খাই টুকরো টুকরো ক'রে রোজ
ক্রমশঃ রসনা খুব লুব্ধ হ'য়ে আসে
কাশফুল ম্লান ক'রে শরৎ কোথায় চলে যায়
ফিরে দেখি খলহাস্যে নিজের কঙ্কাল ভরে আছে।

দিনগুলি এইভাবে ঝরে যায় এ জীবন থেকে
রাতগুলি এইভাবে ঝরে যায় এ জীবন থেকে।

২.
কাচ ভেঙে পড়ে আছে খান খান তেলাভ মেঝেয়
বাইরের দিন যেন প্রাতঃস্নাতা চুলেদের ঝাপটা
সবুজ জলের মধ্যে সময় চলেছে তিরতির
আমিও চলেছি তার সাথে সাথে, ভয়ে।

আমার দুচোখ কেউ খুলে রেখে গেছে খুব কাছে
থকথকে কাদা কাদা বড় স্থির ঠাণ্ডা
আমি খুব যত্নে তাকে ধুয়ে মুছে কোটরে বসাই
তবুও সবুজ জল, তবুও সময় তিরতির।

৪.
সদ্য বিবাহিতা এক অধ্যাপক রতিবিদ্যা শেখান এখন
রক্তের ভিতরে এক দুরন্ত কাফেলা
অন্ধকার ঝেঁপে আসে শরীর ও দুটি দেহ মাঝে।

চিতল মাছের দেহ ঝলসানো সৌর-ঝাপটাতে
সমস্ত ঘরের বায়ু ভরে আছে যৌন উষ্ণতায়
মহাজাগতিক ভারে ফেটে যায় নিঃশব্দ ঝিল্লিকা।

মাথার ভেতরে ঝুল আরশোলা কালো টিকটিকি
এভাবে গভীর রাতে পৃথিবীকে দেখি, ভালো লাগে।

পার্থপ্রতিম কাঞ্জিলাল

সাম্প্রতিক কবিতার পরিপ্রেক্ষিতে

কবিতা প'ড়ে যাচ্ছি : 'অভিজ্ঞতা' বলতে যা বোঝায় তা আরো পরে বলা দরকার। অনেকবার না পড়লে, আমার শানায় না। তবু 'সাম্প্রতিক' শব্দটাকে যদি ৭৯-৮৩ এই ৫ বছর ধরে নিই, তাহলে কবুল করতেই হবে যে চমৎকার সময় চলেছে—কয়েকটি বিপর্যয় বাদ দিয়ে ; ৬৮-৭২ আমরা যারা অনেকটা স্নব, পায়াভারি হয়ে উঠেছিলাম, তারা এখন সে অবস্থায় নেই। যাই হোক, কবিতা ঠিক নয়, কবিদের দু-একটা প্রধান কাজ বাকি থেকে যাচ্ছে মনে হচ্ছে আমার, সেইটেই লিখতে চাই।

এ খুবই ব্যবহৃত কথা যে কবিতা চিনতে গেলে কবিতা প'ড়ে যেতে হয় যথেষ্টই ; এখন, সেই প'ড়ে যাওয়ার উৎসাহটা কে জোগাবে ? সাধারণভাবে, অদীক্ষিত পাঠকদের টেনে নিয়ে আসার মতো মন কি কাজ করছে কবিদের, কবিতাপত্র-সম্পাদকদের ?

মনে হচ্ছে না। এই নয় যে চমৎকার পদ্যই একমাত্র নতুন, শ্যামশৃঙ্গ পাঠকের আকর্ষণ পায়—কবিতা-ও পায়।

কিন্তু সেই কবিতা দুরকম হয়। একটি নিশ্চয়ই, সাধারণভাবে বললে, প্রেমের কবিতা। প্রেম কথাটির অনচ্ছ অতল দিকে আমি যাচ্ছি না ; রমণীপুরুষের প্রেমের কথা-ই বলতে চাইছি।

শম্ভু মিত্র যদিও আমার চোখে কোনো বড়ো অভিনেতা নন, তাঁর একটি উক্তির সত্যতা আমি অনেকবার যাচাই করে দেখেছি। ওঁর বইতে উনি বলেছিলেন, ঝগড়া বা রাগের দৃশ্যে অভিনয় প্রায় সকলেই করতে পারেন, আর, সব থেকে শক্ত হচ্ছে প্রণয়ানুভূতির শরীরপ্রকাশ।

বিনীতভাবেই বলছি, কবিতার ক্ষেত্রে, 'সব থেকে শক্ত' এমন কিছু না ব'লেই, এটা আমার মনে হয়েছে যে প্রেমের কবিতা বা সুপদ্য, কবিতার পাঠকের সংখ্যা বাড়ানোর সাহায্য করে। বিষয়টি সিমপ্যাথেটিক ব'লে, নতুন পাঠক তার গুণে ক্রমে ক্রমে কবিতারই চক্রে চলে আসেন ; আর যাঁরা অভিজ্ঞ পাঠক তাঁরাও কতকগুলো বাড়তি সুযোগ পান কবিসামর্থ্য পরীক্ষার। ভাষা ও মনোভঙ্গী, নতুন অনুপুঙ্খ ও সিচুয়েশন এ ব্যাপারে কবিরা ব্যবহার করতে পারছেন কি না—আধুনিকভাবে পারছেন কি না—সহজে ধরা যায়। আমাদের পূর্ববর্তী অগ্রজরা (সবাই নন) অনেকেই নানাভাবে আমাদের আড়ষ্টতার সুযোগ নিয়েছেনে দীর্ঘদিন ধ'রে। মনে হয়, এদিকটায় মনোযোগ্য চর্চা রাখতে পারলে, একটি মধুর প্রতিশোধ নেওয়া যাবে। আমি জানি যে এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে দুটি আপত্তি উঠবে ; এক, প্রেমকে বিষয় ধ'রে কবিতা রচনা—এর একটা যান্ত্রিক দিক আছে। এর উত্তরে আমার বলার এই

যে, এর একটা কৌতূহলের দিক-ও আছে। দুই, প্রেম, বিষয় হিসেবেই যথেষ্ট চেনা হয়ে গিয়েছে। —তা হতেও পারে, কিন্তু 'প্রেমের কবিতা' এখনো যথেষ্ট চেনা হয়নি। এবং, বিষয় হিসেবেও, আমি যা দেখতে পাচ্ছি, প্রেম, এখনো বেশ ছলিয়া।

(এখন যদি কেউ ভেবে নেন, ও, তাহলে ৭৯-৮৩ তরুণ কবিপ্রজন্ম কোনো প্রেমের কবিতা-ই লেখেননি, সে হবে আর এক মুশকিল। লিখেছেন, সংখ্যা কম। মৃদুল দাশগুপ্তের আধাবাবু—আধাক্যাভালিয়ের থিয়েটারি স্বরে-ভরা লেখাগুলি (প্রেম অনুষঙ্গে) আমি অবশ্যই গ্রাহ্য করবো না, কিন্তু রমা ঘোষ বা কাঞ্চনকুন্তলাকে স্মরণ করবোই, যদিও দুজনের কাছ থেকেই আরো নতুন এক্সপ্রেশনের দাবি আমার রয়েছে।)

দুনম্বরের রকমটা নিয়ে এই ৮৩তেই রণজিৎ ও দেবদাসের সঙ্গে কিছু কথা হবার সুযোগ হয়েছে। এ ধরণের কবিতার creedটা যে বাংলা কবিতায় ছিলো না তা নয়, কিন্তু কখনোই খুব বেশি চর্চা পায়নি। আপনারা যাঁরা রণজিৎ-এর লেখা পড়েন তাঁরা নিশ্চয়ই দেখেছেন যে রণজিৎ একটা অন্য facet বা বাতাবরণে লিখতে চাইছেন। তুমুল ব্যক্তিগত ভিন্নতা নিয়েও, দেবদাস বা নির্মলও ঐ বাতাবরণে বা শব্দপ্রচ্ছদে আছেন। দুটি অভিলাষের সূত্র এখানে কাজ করছে, তা হলো ঃ

১) তৎসম শব্দ, সাধু ক্রিয়াপদ / বিপর্যস্ত ক্রিয়াপদ, যেমন ধরুন গৌতম বসুর 'নিয়ে চলেছে নগরপ্রান্ত,' অন্বয়কূটতা প্রভৃতি প্রায়বর্জন ক'রে, বাংলা কবিতার অভ্যস্ত mysterious চালচলনকে সরিয়ে রাখা ;

২) পরিবর্তে, মোটামুটিভাবে নিম্নমধ্যবিত্তদের বাংলাভাষা কিংবা এমন একটি শব্দাবলী ব্যবহার—যা দেখে, অধ্যাপকরা কবির stock of words নিয়ে মুগ্ধ হতে পারবেন না। দাঁড়ান, এক্ষনি আমার পর এই ব'লে লাফিয়ে পড়বেন না যে 'য়্যা পার্থ, আপনি-ও বামপন্থী—গণমুখী—হতে চাইছেন।' কারণ আমি পালটা অভিযোগ করবো যে তাহলে আপনারা ধরে নিচ্ছেন যে কবিতার আপাত আঙ্গিক বা উপরিপৃষ্ঠই, কবিতার ভাগ্যকে নির্ধারণ করে। এমন ধ'রে নেওয়ার সুবিধে নেই, আর আমি খুবই সুবিধাবাদী। আগেই আমি বলে নিয়েছি যে এই গদ্যটায় আমি লিখছি দুটো কাজের কথা—আমার মনে হচ্ছে যে এই দুই লাইনে কাজ ক'রে যেতে পারলে, সুবিধে করা যাবে। অবশ্য এ আমরা দেখেছি যে, এই দুনম্বরের লাইনে সামান্য কিছু ভালো কাজ বাদ দিলে, প্রায় সকলেই হড়কেছেন। ৭২ পরবর্তী অমিতাভ গুপ্ত কি ৭৬ থেকে নিশীথ—এইসব পতন ; আমি জানিনা যে বামপন্থী হয়ে ওঠার কোনো ঝোঁক ওঁদের ছিলো কি না—এসে পড়তে পারে, ভাবপ্রবণতাবশত। মফঃস্বলের বাস-এর মতো মারাত্মক কবিতা (এবং আমাদের আলোচ্যমান এই লাইনে, বাতাবরণে বা শব্দপ্রচ্ছদে যে কবিতাকে সগৌরবে অন্তর্ভুক্ত করা যায়) যে প্রসূন লিখেছেন তিনিই আবার বন্দুকের নলের ভিতর ঢুকে পড়ছে বাঁকুড়া বীরভূম পুরুলিয়ার মতো ভাবপ্রবণ ও সস্তার ফিল্মী-গিমিকময় পংক্তি লিখে গেলেন—এখান থেকেই বোঝা যায়, কাজটা ভালই কঠিন, এবং এতে অনেকেরই হাত দেওয়া দরকার।

যদিও, একটাই গোলমালের প্রশ্ন এখানে আছে, তা হলো, নিম্নবিত্ত শ্রেণীর

বাংলাভাষা আমরা কতোটা সত্যিই ধরতে পারবো। এখনো আমাদের কবিরা অনেকেই নিষ্কণ্টক কাটাচ্ছেন, কিন্তু তাঁদের গতিবিধি সেই শ্রেণীর দ্বারা নির্ধারিত নয়। আর শারদীয়া উপন্যাস তো নয় কবিতা যে একটা রিমোট ধারণা ও প্রসঙ্গে থাকলেই যথেষ্টে!

এই দুনম্বরের প্রসঙ্গে আর একটা কথা। রণজিৎ, দেবদাস, নির্মল ও প্রসূনের কোনো আলোচনাচক্রের উপস্থাপনা যদি অজ্ঞাতবাসে হয়, মনে হয় যে আরো বিশদ জানা যাবে। এই লাইনে ওঁরা খেটেছেন—এক্সপার্টদের কথা শোনাই ভাল। তারপর আমাদের ধান্দাথাকবে যে কী ক'রে এবার একনম্বরে দুনম্বরে মেলানো যায়, কী ক'রে নিম্নবিত্ত প্রেমিকের ভাষা এই বিত্তপ্রধান প্রেমশূন্য পরিবেশে আনা যায়। নতুন পাঠক যদি না পাওয়া যায় তাহলে একটা গোষ্ঠীচর্চার সঙ্গে কবিতার তফাৎ থাকে না, আর রাজ-নেতাদের লক্ষ্যই সেদিকে। এই পাঠকদের কথা আমি তুলেইছি এই কারণে যে এখনকার কবিরা যদি এমন একটা লাইন না খোলেন তাহলে সমস্ত কবিতার ব্যাপারটাই 'য়ুনিভার্সিটি উইটস', হয়ে যেতে পারে। হচ্ছেও একটু একটু ঃ মল্লিকা সেনগুপ্তর বইটির চতুর্থ প্রচ্ছদের দুটি বাক্য ঃ 'একদিকে রয়েছে প্রাক-আর্য সময়ের খরগোশ, টোটেম দেবতা, বলি, অন্যদিকে এসেছে কিশোর শ্রীরাম, অগাষ্ট কোত, বৈবস্বত। কিন্তু এইসব ছাপিয়ে ২৪ পাতার এই সামান্য বইটিতে 'মূর্ত হয়ে উঠছে এক আসন্ন ভবিষ্যতের প্রতি মায়া'—যেন যাযাবর হয়ে বেরিয়ে না পড়তে হয় আমাদের।' বলবই যে ঐ 'মূর্ত হয়ে উঠছে মায়া' এক নিকৃষ্ট অধ্যাপকীয় ভাষা, যা যথার্থ প্রথম বাক্যটির পাশে আরো ভালো বোঝা যাচ্ছে। আশা করবো ঃ এইসব কথা-বার্তার ভুল, সতীর্থরা, দেখিয়ে দেবেন।

বুদ্ধদেব বসুর কবিতা ও সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের
কৃত্তিবাস-এর পর
অজ্ঞাতবাস-ই এখন
কবিতা-কৃত্তিবাসের চাইতেও ভালো কাগজ
এবং একমাত্র কাগজ।

নির্মল হালদার

রঙ্গ

বট গাছের ফল
আমাকে চাইছে
অর্জুন ফলের হাসি শুকনো হাসিতে
ডুব দিতে চাইনা
বটফলের লাল রঙ
আমাকে চাইছে
আমার চোখে রঙ মুখে রঙ
আমি রঙে রঙে রঙ্গ করি
ভাদর-আদর মাস
আমার বুক পুড়ছে

তিনটে শালিক

একটা শালিক দু'টো শালিক
তিনটে শালিক
ভাইরে, একটা শালিক নিয়ে যা
দু'টো শালিক আমার

একটা শালিক
আমার হাতে ব'সে খুঁটবে দানা
একটা শালিক
আমার মাথায় ব'সে খুঁটবে উকুন
আর একটা শালিক
ভাইরে, পাহারা দেবে
তোর কপালের টিপ

ঊনষাট

মন্ত্রী আসছেন

আমাদের গ্রামে আজ মন্ত্রী আসছেন
আম পল্লবের সেট কতো ফুলের মালা
আমরা তৈরি করেছি
আমরা কেউ আধ ন্যাংটো কেউ ন্যাংটো
কারো চাল নেই চুলো নেই, তবু আমাদের গ্রামে আজ
মন্ত্রী আসছেন

আমাদের গ্রামে মন্ত্রীর মতোই পঞ্চায়েতের এক
প্রধান আছেন
তিনি আমাদের কখনও ডাকেন কখনও হাসেন
কখনও কথা বলেন কখনও চুপচাপ থাকেন
তিনিও আজ ব্যস্ত, মন্ত্রী আসছেন

আমাদের গ্রামে একটাই কুয়া, ফাগুন থেকেই
নেই নেই জল
বোশেখ থেকে দূর কাঁসাইয়ের বালি খুঁড়ে
মেয়েরা নিয়ে আসে জল
মেয়েদের মাথার ঘোমটা ছেঁড়া, তবু
আমাদের গাঁয়ের রঙ ধূলা উড়িয়ে
আমাদের গ্রামে মন্ত্রী আসছেন

আমরা কেউ আধ ন্যাংটো কেউ ন্যাংটো
কেউ কাঠ কাটি কেউ কোদাল চালাই

সন্তোষ রায়

যুদ্ধে যাব

কেউ একা একা প্রাসাদ হয়ে ওঠে
কেউ খর-কুটিরে ঝাঁক বাঁধে পাড়ে
ভাঙনের উপরে উঠে রক্তিম মমতার চাঁদ
টায়ারের গতি পথ ছেড়ে, ইথারের দৃশ্য লোভ ছেড়ে
আমি পালিয়ে যাই স্বাধীনতা দিবস থেকে অনেক দূরে
আমাদের মাটির কাছে
বুকের পাঁজর মেলে দু'চালায় মাথা গুঁজি
এখান থেকে দু'মুঠো খেয়ে যুদ্ধে যাবো আমরা
সূর্যাস্তের নীচে আরেক অস্তিত্বে জ্বলে থাকবে হুবহু ফসল
নক্ষত্রের নীচে মানুষের কালো মাথাগুলি ঘোরে অনবরত
ঘোরে ভিড়ের চোখগুলি ক্ষুধার্ত জোনাকির মতো এলোমেলো
আমার শিশুটি ভাঙা জানালা বেয়ে দেখে পথের মলিনতা
ভাত এনে তাকে মানুষের রঙ শেখাবো
আমাদের টিপসহি ভিট থেকে স্বাধীনতা দিবসটি দেখা যায়
দূরে নরম রশ্মির ভেতর টাল খায়
শতাব্দীর শূন্য খুলিটির ভেতর দিয়ে আমরা যুদ্ধে যাবো
নিচে নদীর বাসনা বয়ে যাবে অন্তরঙ্গ মাঝি

কুঁড়ি

ততোক্ষণে শুকনো ডালপালাগুলো ভেসে উঠেছে বুকে,
বুড়ো যখন কুঁচকানো হাতটা সটান মেলে ধরে পথের পাশে
তখন ভিড় শূন্য। ফসল শূন্য হাতের রেখাগুলি
ফেটে চৌচির দেখা যায়, হাতের পাশে পথটি গতিশীল,
চারপাশে নব ঘোরাফেরা হাঁটাচলা, ভায়োলিনের করুণ সুরে
সময় ওঠে এককোণে, বুড়োর নাতি মাঝে-মধ্যে উঁকি দেয়
হাতের কানায়, বুড়ো বলে—দিনের আলোয় রুপোলি চাঁদ
দেখা যায়না।

পাশের বাড়ির নক্ষত্র খচিত পর্দা নেড়ে মেঘ ডাকে ভেতরে—
'এদিকে আয় হরেক মাল কা বৌটি' ঝাঁকা মাথায় ফুলদানি
ঢুকে পড়ে নক্ষত্রলোকে। শিশুটির মা'র কথা মনে আসে।
এতোক্ষণে কাঁধের উপর দিয়ে অনেকটা সময় চলে গেছে,
টায়ারের উল্টোধুলো এসে জমেছে খোলা হাতে। বুড়োর
খোলা হাতে শহর ঘোরে, লাঠির কানায় উড়ে চলে কিশোর
ডানার ঘুড়ি, শহরের হস্তরেখা বড়ো উজ্জ্বল দুপুর হেমন্তে

সারাদিনের সিঁড়ি ভেঙ্গে সূর্য তখন মাটিতে
কিশোরটির অতর্কিত চিৎকারে যন্ত্র শহর বন্ধ হয়ে যায়
—অন্ধকার হয়েছে, রুপোলি চাঁদ দেখবো দাদু!

বুকের ডালপালাগুলো জড়িয়ে ধরতে ধরতে বুড়ো টের পায়
শুকনো ডালে কুঁড়ি জ্বলছে একটা

প্রফুল্ল দাস

শ্রমিক

সারাদিন খেটেখুটে সে বাড়ী ফিরে এলো
তখন পশ্চিম আঁধার
ভাত বেড়ে দিয়ে তার বৌ কপাট ধরে
দেখে, তার গোগ্রাসে খাওয়া
সে ঘুমিয়ে পড়ে মাটির ওপর চাটাই পেতে
আর ভাবে শ্রমের কথা
রাত্রি যত গভীরতর হয় ; ঘুমে বুজে আসে চোখের পাতা
সে স্বপ্ন দেখে তার শিশুসন্তানের মুখ
তার সন্তান জন্ম নিচ্ছে শ্রমিক হয়েই
আর অকারণ ঘুম ভেঙে যেতে দেখে
তার শরীর ও বিছানার মাঝে একটুকু ফাঁক রয়ে গেছে।

জাতক

সুতপা সেনগুপ্ত

কোথাও কিছু নেই কেবল আঁখিপাতে এ ঘোর বর্ষা
শরীরে জতুঘর সমাধা হয়েছিল, এবার বিস্ফার
জ্বালাও তবে প্রাণ পোড়াও বাতিদান কেন যে রাখছো
আমায় ধরে আর, বৃথা এ পাপভার বইতে চাই না,
জীবন কতো দূর অজানা বন্ধু এসেছে আজো হেসে
তবু কি সন্ধেকে আমিই আনি ডেকে অযথা দিন শেষে ?
কোথায় যাবি তুই ওদিকে কিছু নেই কেবল ইস্পাত
আমার এই বুকে বেজেছে থেকে থেকে ভুলের ভৈরব
হৃদয় থাক্ তবে বসুক এইখানে আমার পাঁজরে
তোমার মুঠোভরা সূর্যশশী তারা রক্ত-রজনীর
সমূহ জুড়ে থাক অসাধু বিস্বাদ, বিছানো শরীরে
বনজ রস টেনে বাড়ুক দিনে দিনে কলঙ্কের চাঁদ

রুদ্ধ হোক চাবি কেবল সন্তাপই আছে এ জীবনে
হয়তো ফিরে যাবে তোমার অভিশাপে আমার সব বীজ
নিহিত গর্ভের প্রজাত আঁধারে কাউকে দেখবো না
তোমার মুখ যদি গরলে ঢাকা পড়ে তারাও তবে থাক্
না হয় এ দেশের পুরোনো শীত এসে জড়াবে মোমবাতি
নিভবে টেবিলের সকল আলোছায়া, ঘুমের পথ বেয়ে
স্মৃতির আবছায়া পেরিয়ে অবশেষে নিহত বুদ্ধ
তুমিই তবে একা দাঁড়াও বোধিমূলে হৃদয়ে ভ্রান্তি
কেউ তো নেই কাছে কেউ তো আসবে না, এমনি সত্য
যে তার মুখোমুখি দাঁড়াতে ভয় পায় সকল পারাপার
কেবল সূর্যই এসেছে মাথা নিচু প্রণাম জানাতে
এবং দিনশেষে তোর মা যাবে হেসে ও পাড়া বেড়াতে

তুই কি একা একা কেবল বসে থাকা মাটিতে গোপনে
কেবল যাবি মিশে মায়ের নুনে বিষে, কোথাও ক্ষোভ নেই
পৃথিবী জুড়ে তোর একলা ঘুমঘোর না-ভাঙ্গা শর্তে
তুই কি যাবি মিশে কেবল বিষে বিষে খিদের গর্তে

জাগাবে কেউ তাকে, কখনো যদি খুব কষ্ট হয় বুকে ?

মায়াপৃথিবী

শমিত মণ্ডল

অনেকক্ষণ ধরে বৃষ্টি হলো। একটু একটু ঝড়ও হলো। এখন সন্ধ্যায় আকাশের ততো ভার নেই। আর আকাশ যেন ধরাছোঁয়ার মধ্যেই। আরে, একফালি চাঁদও আছে! গুরু গুরু গুরু গুরু শব্দ হচ্ছে কোথায়? শহরের মধ্যে ছোট্ট একটুখানি ঘর। পাশে একটি শাদা ফুলের গাছ। দুটি ব্যথা চোখ জেগে আছে, তাকিয়ে আছে বাইরে। বিমন বালক চোখে কেন এত বিষাদঅশ্রু! জেগেছিলো একটি রাতপাখির মতো বালিকা। আহা, কেঁদেছে এই পুষ্পকলিও। নাহলে এত অশ্রুলেখা কেন তার চারপাশে!

প্রথমে বদলে গেলো মাটির রঙ। কালো কুৎসিত মাটিতে লাগলো সবুজ আভা। নড়ে উঠলো গাছপালা। একটু যেন শোঁ শোঁ শব্দ। দুজোড়া চোখ দেখলো এসব। তাদের চারপাশে আজ আর নেই তারজাল। 'আহ্, আলোপ্রবাহের গান, প্রস্তর-হীনতার কাছে ঋনী'—বলে ছুটে এলো তাদের হৃদয়। লাফিয়ে উঠলো আনন্দে। আঃ দেখো লাফাচ্ছে গাছপালারাও। কে দেখবে? কেউ তো এখন জেগে নেই। জেগে আছে শুধু গাছপালা। আর জেগেছে পোকামাকড়। ঘুরে ঘুরে উড়ছে। এরা দুজনও কি মানুষ নাকি! কেমন নাচছে গাছের সঙ্গে গাছ হয়ে!

শব্দ হচ্ছে গুমগুম। পাল্টে যাচ্ছে সব কিছু। অচেনা গন্ধে ভরে উঠছে বাতাস। অন্যরকম গন্ধ। ছোটো সব গাছপালা হয়ে যাচ্ছে দীর্ঘঋজু। আঃ কি সুন্দর। আর কত দেরী, আরো কত দেরী? গোল হয়ে একটুখানি জায়গায় উড়ছে পতঙ্গেরা। উড়ছে দুজন, তাদের গলায় ফুটে উঠছে গান। আর কেউ জেগে নেই। সমস্ত সুখী মানুষেরা ঘুমিয়ে আছে বিছানায়। তাদের নিঃশ্বাসে ধ্বস্ত শব্দ। তারা স্বপ্নের ভেতর নৌকো চালায় না, গেয়ে ওঠে না আনন্দ গান।

আর কত দেরী, আরো কত দেরী মায়াপৃথিবী আসতে আরো কত দেয়ী?

অলোকনাথ মুখোপাধ্যায়

বাতাসে আগুন ঝরে

বাতাসে আগুন ঝরে। তুমি যাও
ভিতর দালানে—সারাদিন
তোমাকে দেখার কেউ নেই—তুমি তরমুজ
দাঁতে কাটো, রঙে ভাসে জামা, তুমি
বুঝে নাও খুব, প্রকৃতির
অলৌকিক ক্রূর। শান্তি পাওয়া
তোমাকে মানায়, প্রিয়, বালি খুঁড়ে জলের প্রত্যাশা
তোমাকে মানায়, প্রিয়—অতএব শীত
একান্ত থাকুক ছেঁড়া জামাটির ম্লান, খ'সে-পড়া
বোতামে বিধৃত

মোটে প্রাসঙ্গিক নয় এইসব—তবুও বাচাল
বাতাসে আগুন ঝরে, আর
মনে পড়ে মানুষের ষড়যন্ত্রময় কররেখা
অন্য মানুষের প্রতি—সারাদিন
অতএব নিজেকেই রাখো পাহারায়

দালানে, কুয়ার ধারে, জমে ওঠে তরমুজের রক্তিম দলিল।

স্বচ্ছ হ'ক জল

এই খেলা, এই ঘাড় গুঁজে স্তব্ধ চেয়ে থাকা
বিমূঢ় ফাৎনায়
জলের প্রচ্ছদ দেখে বুঝে নেওয়া জলের আড়ালে
অসহজ যত আন্দোলন
আমি চাই খুলে যাক রঙের পরত, স্বচ্ছ হ'ক জল।

যে কেবল হাতে পায়ে নানান্ কসরৎ করে, ভেঙে যায়
কোমর, গোড়ালি
যে কেবল বনের চৌকাঠ থেকে হাততালি দিয়ে ডাকে
জড় দেবতাকে
তার জন্যে এই খেলা নয়—তার জন্যে এই
পৃথিবী রঙীন বলে মনে হয়—তার
জন্যে শুধু কমলা আপেল
ফ'লে আছে।

তরুণ দাশ

প্রেম

লাল গেঞ্জি, মাথায় টুপি
রোজ বেরিয়ে পড়ে যুবক,
হাতে থাকে রেঞ্জ, চেইনটাংগ
গ্রামে গ্রামে নলকূপ সারে
জল উপচে পড়ে, ভাঁত হয় হাঁড়ি-কলসী-বালতি।
নলকূপের গায়ে হেলান দিয়ে
হাসিতে ভেঙ্গে পড়ে যুবতী, টুসকী মেরে গান ধরে
ও কারিগর বন্ধু তোকে দেইখ্‌লে লাগে হাঁসি
বুপের কারিগর কইরবো তোকে
কিনে দুবো পিতল বাঁধা বাঁশী···

জল থৈ থৈ নলকূপ, নলকূপের গায়ে যুবতী
স্বপ্ন সাধ জলের সাধ
জলের আর এক নাম প্রেম।

মুকুল চট্টোপাধ্যায়

গান

বীণায় রেখেছ হাত
তারগুলি ছু'য়েছে আঙুল
বৃষ্টির দিনে, ধরেছ প্রিয় মেঘের রাগিনী
আমাদের শোনাও শুধু একা।

জন্ম নিক কিছু সুর ; মৃত্যু হোক অনেক কথার
আমাদের মাঝখানে কেন আলো ? তুমি, ফেরাও তমসা।
অনুগত সুরগুলি শোনাক ইমন্
আমরা আঁধারে যাব, সাথে যাবে আমাদের বীণা।

দুটি কবিতা

অসিত সিংহ

মাছ ধরা

ভাদর মাসের রাতে, ঘুগি হাতে, ভাঙ্গা আল চিনে চিনে, ধানক্ষেতে ঘুরি
রক্ষা দে মা বিষহরি—এই সময়ে এই আমার রুজি ;
মাছভরা ঘুগি নিয়ে, নিশিভোরে, ভালয় ভালয় যেন ফিরি।

যত রাত বাড়ে, আলের ভাঙ্গন দিয়ে জাগে খালি, জলের কু-নিশ্চয় ধ্বনি
চকমকি পাথর জ্বালি, লক্ষ্যে আসে ঘুগির ভেতরে ভরা বুদ্বুদ, পেট খালি,
বাঁশের ছাতায় মাথা গাঁট খুলি, জুনুর-সিজায় দি জোরসে কামড় ; পরিশেষে চুটি টানি

রাতের পহর আরও বাড়ে, সামনে ফদর্‌ফাই মাঠ, পেছনে শ্মশানকালী
ভিতরে মোচড় দেয় শুকনা-হাতের ধনি, বেটা দয়াময়, বিটি ফুলমণি
মনে ভাবি কি দোষে জনম যায়, বাঁচা দেখি চুয়াড়-চণ্ডালী।

হাই উঠে, কিছুদূরে চাটান্-পাথরে শুই, কিছুপরে ডাক ছাড়ে পাখি
ঘুগির সামনে আসি, হাতে তুলি, আধভরা ঘুগি ;
ঘরমুখে যেতে যেতে, কামারকুলির মাঝে খুড়া হাঁকে : কয়টি-বা চ্যাং কয়টি-বা
কাঙ্কুড়ি !

ধানকাটা

ধান কাটি, আর গান করি, আঘনের ;
গিজিতা গিজাং ধো, গিজ্‌তা গিজা
বেঁচে র' ঝুমুরিয়া ভবপ্রীতা ওঝা

দা চালা তাড়াহুড়ি, বেলা হল ডুবুডুবু
বসে আছে প্যাড়সামুখা গলা-ঘরের ছা
দেখলে পরে অকাই ছুটে, দেহ যেন ধান-ঠেঙ্গা পাটা।

ট্যারা চোখে তাকাস না, হে বিন্দা,
মরদ আছে ঘরে ; থুব্‌ড়া হয়ে দিন কাটালি,
নোতন যৌবন আমার, ভাবের আগুন ক্যানে জ্বালালি ?

উঠো সব, দা ছাড় ; সাঁঝ আছে, মাড়ুলি আছে, সয়দা আছে করার—
জানি, তুই ভারি ডিগর ধন, মরলি অকারণ
পশ্চিমা আকাশে দ্যাখো ফুটল কাঁচা রঙ ॥

অরণি বসু

টানাপোড়েনের দ্বাদশী

১.
কেন শুধু বেঁচে আছো ? কেন ?

২.
লতায় পাতায় ছড়িয়ে যায় মানুষের ঘোর আত্মীয়তা, আর
রক্তের সম্পর্ক জুড়ে তৈরী হয় যত অবিশ্বাস, জটিলতা।

৩.
আধো-অন্ধকারে যখন হাওয়ায়
আছড়ে আছড়ে পড়ছিল তোমার খোলা চুল
পিছনে দাঁড়িয়ে হঠাৎ মনে হ'ল, আজ এতদিন পরে
অবশেষে আমরা এসে দাঁড়িয়েছি সমুদ্র-সৈকতে।

৪.
'ক্ষমা' কর' এই সমাপিত শব্দ দু'টি আজকাল মনে মনে উচ্চারণ করতেও
বুকে অদ্ভুত চাপ লাগে। মনে হয়, আর দেরী নেই।
পুজোর সামান্য আগে আমি বত্রিশ পেরিয়ে এসেছি।

৫.
তুমি তো আমার কেউ নও,
তবু, তোমার কাছে এলে বড় শান্তি শান্তি লাগে, তোমার শরীরের
আশ্চর্য স্নিগ্ধতা বড় জব্দ করে রাখে আমায়। যেন
নরম পুকুরপাড়ে বটগাছের ছাতার তলায় বসে আছি।

তুমি তো আমার কেউ নও,
তবু, তোমার কাছে এলে আমার অনন্ত ছুটি, মনে হয়।

৬.
কৈশোরের সেই রোমাঞ্চ আর নেই, নেই আর বিশ্বাসের সরলতা
গহন-জীবন-কুজ্ঝটিকায় জেগে আছে শুধু আপাদমস্তক লোভ।

৭.
অনেক কথা বলা হ'ল বত্রিশবছর ধরে,
এসো, আজ উৎসবের আলোর তুবড়ির দিকে চেয়ে
দুঃখী বারান্দায় আমরা দু'জন চুপ ক'রে বসে থাকি।
নতুন জামাকাপড়ের আর মাংসের ঘুর্গানির গন্ধে ভাসতে ভাসতে
যে কথা বলার নয় মানুষেরা আজ তাও বলে ফেলেছে।

ক্ষীণ ঢাকের শব্দের পাশাপাশি একটা একা সানাই
আরো একা একা বেজে চলেছে দূরে—
উৎসবমুখর এই ম্লান সন্ধ্যায় সে-ই বুঝি শুধু
বুঝতে পেরেছে আমাদের

৮.
তরুণতর কবিদের ঘরোয়া সভায় আজ টের পেলুম
'সহজবোধ্যতা' অনেকেই আজ অসহজ ভাবে নেয়।
কবিতার জটিলতা নিয়ে তবুও আমার কিছু প্রশ্ন থেকে গেছে.
নিজের অ-জ্ঞান যতদূর সম্ভব ঢেকে তার দু'একটি তুলতেই
একটু সরল হেসে সুবোধ বলল,
'আপনার অতি সরলীকরণের ঝোঁক, অরণিদা, মোটেই ভালো নয়।'

৯.
আবোলতাবোল ভাবে অনেকটা সময় নষ্ট হ'ল।
আর নয়, এবার অন্তত আড়মোড়া ভাঙ্গা শুরু হোক,
আবার কাঁধে তোলা যাক হ্যাভারস্যাক।
আবার আমাদের যাত্রা শুরু হোক আর এক আরম্ভের দিকে।

যে গণ্ডীর ভিতরে আমাকে তুমি আটকে রেখেছো
আমি তার বাইরে বেরিয়ে মানুষের বুকের গভীরে যেতে চাই।

১০.
এই হেমন্তের রাতে যদি আমরা আবার মুখোমুখি বসি
আমাদের সব রাগ আর অভিমানরাশি শিশিরের মত ঝ'রে যাবে নাকি!
জীবনের টানাপোড়েনের থেকে কয়েক মুহূর্ত ছুটি পেলে
আমাদের চোখে আবার জ্বলে উঠবে নাকি ভালোবাসার সরল সংকেত!

১১.
কে জানে ভুল পথে চলেছি কিনা!
দিকচিহ্নহীন অন্ধকারে ভেসে যেতে যেতে
একটু আলোর জন্যে বুক খালি করে বসে আছি।

১২.
আমার সমস্ত পাপ তুমি ধুয়ে দাও।
এ কেবল তুমিই পারো—আর কেউ নয়।
পাপের শৃংখল থেকে কর্তব্যের দায় থেকে মুক্তি পেয়ে
আমি যেন উড়ে যেতে পারি সেই দেশে
যেখান থেকে আর কোনদিন ফিরতে হবে না।

অরুণকুমার ঘোষ

সত্তর দশকের কবিতা : ১

'বাতাস উঠেছে আজ বাতাস উঠেছে ফের গভীর বাতাস।' ('এ দেহ পিঞ্জর, ঋক্ষ মেষ কথা—সুবোধ সরকার)

হঠাৎ কোথা থেকে মন-কেমন-করা বাতাস বয়, বাঁধন খসে পড়ে সব দৈনন্দিনতার, অস্তিত্বের শিকড়ে লাগে তীব্র টান, অন্তর্গত রক্তক্ষরণে শুদ্ধ হয়ে ওঠে সত্তার গহন। কবিতার কাছে এমনতর অনুভূতির শিহরন বারবার প্রার্থনা করি আমি। কবিতায় সব চতুরালি, বাইরের ঔজ্জ্বল্য, সপ্রতিভতার চমক একদিন ফিকে, বাসি হয়ে যায়; শেষ পর্যন্ত থেকে যায় ভেতরের টান, আভ্যন্তর স্পন্দন, উচ্চারিত কথার ফাঁকে ফাঁকে ঝিকিয়ে ওঠা আলো, নাকি অন্ধকার! ডিলান টমাস এই গভীর উন্মীলনের মুখোমুখি এনে আমাদের কৃতজ্ঞ করে তোলেন যে, 'শ্রেষ্ঠ কারিগরি সবসময়ই একটি কাব্যকর্মে ছিদ্র ও ফাঁক রেখে দেয়, যার মধ্য দিয়ে, কবিতার মধ্যে নেই এমন কিছু বুকে হেঁটে, হামাগুড়ি দিয়ে, বিদ্যুৎ-চমকে বা বজ্রের গম্ভীর নিনাদে ঢুকে পড়তে পারে।' বহু-ব্যবহৃত শব্দবন্ধ বা বাক্যবন্ধের যান্ত্রিক ব্যবহার, স্মার্টনেশ বা সপ্রতিভ চাতুরী ও চমকের প্রলোভন, বহিরঙ্গের চাকচিক্য বা ভঙ্গিপ্রাবল্যে ভাব ও ভাবনার দীনতা ঢাকার প্রয়াস, এখনকার বাংলা কবিতায় শুদ্ধতা ও গভীরতার সন্ধানকে প্রায়শই ভ্রষ্ট করে দেয় ঠিকই, কিন্তু এরই মাঝখানে কিছু তরুণ কবির উচ্চারণে এই ভেতরকে ছোঁওয়ার আন্তরিক আর্তিও যে কমবেশি আমাদের নাড়িয়ে দেয়, তাই বা অস্বীকার করি কি করে? ফলত এই আর্তি, এই অন্বেষণই সত্তরের দশকের কবিতার ঋদ্ধি ও অর্জনকে অনস্বীকার্য করে তুলেছে।

রণজিৎ দাশের 'আমাদের লাজুক কবিতা'-র ভূমিকাস্বরূপ 'কবিতা লেখার অজুহাতে'-তে পড়ি: 'কোনো বিষণ্ণ ভাটিয়ালি গানের মতো নিঃঝুম ব্যাকরণহীন জীবন চেয়েছিলাম। একই সঙ্গে চেয়েছিলাম ক্যাবারে-নর্তকীর পরচুলার মতো উদ্দাম ঝলমলে রঙ জীবন।' এই কবির কবিতায় স্মার্ট উচ্চারণের প্রবণতা বা সপ্রতিভতার কায়দা সহজেই দৃশ্য হয়ে ওঠে, প্রকট হয়ে পড়ে যৌনতা, কিন্তু তারই সঙ্গে অনস্বীকার্য জানান দেয় আবহমান কবিতার অন্তর্লীন রণন। কবিতার কারিগরি বা নির্মিতির ওপর তাঁর নিয়ন্ত্রণ তর্কাতীত; পারিপার্শ্বিক বাস্তবের অনুধাবনেও তিনি সজাগ, কিন্তু এরই মধ্যে তাঁর উচ্চারণ এক অপ্রতিরোধ্য ভেতর-টানে অনুরণনময় হয়ে ওঠে। বেশ ঋজু সটান উপস্থাপনের মধ্যেই চকিত মোচড় দিয়ে অনায়াস স্বাভাবিকতায় রণজিৎ আমাদের দৃষ্টির সামনে অন্য এক দিগন্তকে উদ্ভাসিত করে তুলতে পারেন। কখনও মনে হয় একই সঙ্গে তিনি তুখড় ও স্পর্শাতুর, যেন বা বেঁচে থাকার বেদনায়ই, অস্তিত্বের বিষাদেই, কিছুটা সপ্রতিভতা রপ্ত করে নিয়েছেন! 'আমাদের লাজুক কবিতা' শীর্ষক নামকবিতায় রণজিৎ যখন এইভাবে শুরু করেন:

আমাদের লাজুক কবিতা, তুমি ফুটপাতে শুয়ে থাকো কিছুকাল
তোমার লাজুক পেটে লাথি মেরে হেঁটে যাক বাজারের থলে হাতে
বিষণ্ণ মানুষ

তখন বুঝতে পারি তিনি চান দৈনন্দিন বাস্তবের রুক্ষতাকে স্বীকার করে নিয়ে কবিতা সাবালক, সম্পূর্ণ ও মানবিক হয়ে উঠুক। কিন্তু শেষে, 'ধীরে ধীরে রোদ-ঝড়-শীতের কামড়ে তোমার সোনার অঙ্গ কালি হবে / ওই পোড়ামুখে তবে ফুটবে তামাটে আভা পৃথিবীর. তাই দেখে / ফুটপাত-শিশুরা ভারি ঝলমলে হাততালি দেবে', লেখার পরেই, 'তাদেরকে দিও তুমি ছন্দজ্ঞান, লজেন্স দিও না'—এইরকম একটি মোচড় দিয়ে যখন তিনি কবিতায় ছেদ টানেন, তখন তা নিছক কৌশলমাত্রে পর্যবসিত না হয়ে আমাদের অনুভবে, বোধে অনুরণন জাগিয়ে তুলতে থাকে। 'জলবিদ্যুৎ' কবিতায় 'যতীনের বড়বোন ডুবুরির নগ্নছবি লুকিয়ে আমার ঘরে নিয়ে আসে. / তার চোখে ও নিতম্বে শুদ্ধ সাবমেরিনের ছায়া—জলোচ্ছ্বাস বিনা/তাকে তৃপ্ত করা অসম্ভব—গ্রীষ্মবাতাসের ঘর হাহাকার করে'—এতে 'ডুবুরি' ও 'সাবমেরিন'-এর অনুষঙ্গে যৌনকামনায় অবচেতনের অন্ধকার উঠে আসে, 'জলোচ্ছ্বাস' শব্দটি অন্য আয়তন পেয়ে যায়। 'প্রতিটি শব্দের নাম নীলাঞ্জন' কবিতার শেষ স্তবকটি কিছুটা একমাত্রিক বিবৃতিতে যেন নীরক্ত হয়ে ওঠে, কিন্তু ঠিক তার আগের স্তবকেই পাই এমন স্পন্দিত উচ্চারণ : 'বরং এভাবে তার আবেদন ছুঁয়ে যাবে অন্ধ পারিপার্শ্বিকের মুখ / ঝাঁপানো বৃষ্টির মধ্যে যার কোনো চিহ্ন নেই / ভেতরবাড়িতে শুধু স্মৃতিঘন নরম মল্লার জমে আছে / দীর্ঘ হাসাহাসি করে হেঁটে আসা মানুষের অপেক্ষায় / যার স্পর্শে একবারই জন্ম ও মৃত্যুর মধ্যে কেঁপে উঠবে প্রত্যেকের / তাবৎ মহিমা'। এর সঙ্গে থীমের দিক দিয়ে গভীর যোগ রয়েছে এই বইয়ের শেষ কবিতা 'সম্বোধন'-এর। সেখানেও আছে 'নীলাঞ্জন', মেঘের এই অভিধা-সম্পর্কিত অনুধাবন। তবে এ কবিতায় যৌনতার সংরক্ত স্পর্শ সঞ্চারিত হয় 'জলবিদ্যুৎ' কবিতায় উল্লিখিত 'যতীনের বড়বোন'-এর পুনরাবির্ভাবে : 'যতীনের বড়বোন ছাদের আলিসা থেকে সরে যায় বোবা পৃথিবীতে / ফলে যে শূন্যতা নামে ছাদের আলিসা ঘিরে, মেঘ তাকে স্পর্শ করে'। তবে কবিতাটির একেবারে শেষে যে পড়ি : 'চাষাড়ে মেঘের দিকে আর্তচোখে ছুটে যায় আমাদের বাবু সম্বোধন : / 'নীলাঞ্জন, প্রিয় নীলাঞ্জন !', তাতে 'চাষাড়ে' ও 'বাবু' বিশেষণদ্বয়ের প্রকট বৈপরীত্যের ওপর জোর প'ড়ে এক সপ্রতিভ উচ্চারণের তির্যকতাকে ধরিয়ে দেয়। 'আরো কিছু রঙ্গ' কবিতায় 'সমস্তই ভালো লাগে, / মহিলা, উদাসী সঙ, হিজড়ে ও গরু, শিক্ষিত ইস্পাতমন্ত্রী, / সমস্তই বোঝা যায়, গাড়ি বা গাছের থেকে নেমে আসা, / নাচ-গান, বৈশাখে ডমরুশব্দ, ভাষণে বজ্জাতি—/সবাই একটি ঠ্যাং তুলে আছে, ল্যাম্পপোস্ট পেলেই ভেজাবে।'—এই দেশজ মস্করায় যদি বা একটু সপ্রতিভতার কাঁধ-ঝাঁকানো পাই, তার পরেই যে চমক রয়েছে তা কিন্তু চমকমাত্র না থেকে একটি নিষ্ঠুর সত্যের উন্মোচনে আমাদের ভেতরটা হঠাৎ কেমন ফাঁকা করে দেয় : 'আরো কিছু রঙ্গ আছে—যেমন কেরাণী, তারা শোনা যায়, / স্বপ্নে দ্যাখে—জল বা পাহাড় নয়—রেফ্রিজারেটার'।

অজ্ঞাতবাস

'বৃক্ষরোপণের গান' কবিতায় তীব্র রিরংসা, যৌনতা শেষ পঙ্‌ক্তিতে নিসর্গের প্রসারিত গীতিময়তায় উত্তীর্ণ হয়ে যায় : 'যেদিন পরুষ থাবা রাত্রিময় ভেঙ্গে পড়ে তোমার বিদ্যুৎগর্ভ চুলে / তুমি ভয়ে স্বতঃস্ফূর্ত শীৎকারধ্বনি করো, সেই ধ্বনি কান পেতে শোনো, / শোনো বৃক্ষরোপণের গান বেজে ওঠে এক জাগ্রত গুহায়।' 'জাগ্রত গুহা' যদিচ অনতিপ্রচ্ছন্ন ইঙ্গিতে নারীর জননেন্দ্রিয়কেই নির্দেশ করে, তবু 'বৃক্ষরোপণের গান' কথাটি সৃষ্টি-উন্মুখ নিসর্গের ব্যাপ্ত অনুষঙ্গে যৌনতাকে এক বৃহত্তর তাৎপর্য দেয়। 'নৈশ ফুটপাতের একটি দৃশ্য' কবিতাটি রণজিতের কবিমানসতা ও উপস্থাপনকে বিশেষভাবেই উন্মোচন করে। স্থূল রুক্ষ, অসুন্দর বাস্তবতার উদ্‌ঘাটনের সঙ্গে এখানে মিশে থাকে যৌনতা, সপ্রতিভ বর্ণনার ঈষৎ চমকের পরেই পরিচিত নিসর্গদৃশ্যের উপস্থাপনে উঠে আসে কবিতার সেই অমোঘ ভিতর-টান, আভ্যন্তর স্পন্দন। 'শুকনো লঙ্কা পোড়ার গন্ধে বুড়ির খিদে চাগিয়ে উঠলো / বুড়ির শ্যাওলা-ধরা মুখে কালচে নীল লালা গড়িয়ে আসে'—এ একেবারে প্রকট বাস্তবতা। কিন্তু তারপরই, 'আগুনের চাপা লাল আঁচে / বুড়ির সুখের বলিরেখা হিয়েরোগ্লিফিক্‌স্-এর মতো রহস্যময়'—এই বর্ণনায় বাস্তবের মধ্যে বাস্তবাতীত এক আয়তন সংযোজিত হয়ে যায়। 'চারিদিকে ঝিম-ধরা রাত্রিবেলার, ময়লা প্লাস্টিকের শহর'—এই বর্ণনা শহরের বাস্তব চিত্রেই ভাবকল্পনার একটি পৃথক মাত্রা জুড়ে দেয়। 'প্লাস্টিক' শব্দ ও বস্তুটির মধ্যেই যেন ধরা দেয় একালের বাহ্য-চমকপ্রিয়, ক্ষণিকতাবিলাসী শহুরে মানসিকতা। 'প্লাস্টিকের শহর' বললেই নিসর্গের শুদ্ধতা-বিরহিত কৃত্রিম, ভঙ্গুর এক পারিপার্শ্বিকতা প্রকট হয়ে ওঠে। 'একটি বড়লোকের বৌ কড়া এসেন্সের গন্ধ ছড়িয়ে হেঁটে যায়/দাদ চুলকোনোর নখ দিয়ে বুড়ি সেই এসেন্সগন্ধ ছিঁড়ে-খুঁড়ে/বৌটির শরীরের বুনো ঋতুগন্ধের হদিশ খোঁজে'-তে ঘিনঘিনে শরীরী বাস্তবতার সঙ্গে যৌনতা মিশে থাকে। 'সারা শহরে অসংখ্য মানুষ খেয়ে উঠে সিগারেট ধরায় এ সময় / নিকোটিনে ভরে ওঠে অসংখ্য খুপরির গৃহস্থালি, ড্রয়ার থেকে/লাফিয়ে ওঠে নিরোধের প্যাকেট',—কিছুটা স্মার্ট, চালাক বর্ণনা। 'বুড়ি অতো খবর জানে না, কেবল/ভাতের হাঁড়ির দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে/বুড়ির মনে পড়ে আগামীকাল দুপুরের ভাতের হাঁড়ি'—এ পর্যন্ত নিরলঙ্কার. সহজ বাস্তব, তারপরই হঠাৎ পরস্পর-বিচ্ছিন্ন, বিষম কিছু পার্থিব ও নৈসর্গিক উপাদানের সমাবেশ এই বাস্তবকে বাস্তবাতীতের মধ্যে নিঃসীম ব্যাপ্তি ও মুক্তি দেয় : 'দ্বিগুণ খিদেয় বুড়ি জিভ দিয়ে চেটে শুকনো ঠোঁট নক্ষত্র ল্যাম্পপোস্ট / স্মৃতি ফুটপাত ও অন্ধকার ভিজিয়ে নেয়'। শুকনো ঠোঁট : নক্ষত্র, ল্যাম্পপোস্ট : স্মৃতি, ফুটপাত : অন্ধকার—সীমায়িত ও অসীম, বাস্তব ও বাস্তবাতীত, মূর্ত ও অমূর্ত, এই বৈপরীত্য-চিহ্নিত উপাদানযুগ্মের পরপর সন্নিবেশ এখানে বিশেষভাবেই অভিঘাতী হয়ে উঠেছে। আর সবশেষে 'ভাতের গ্রাস তুলতে গিয়ে বুড়ির হাত বার বার/পাখির ভারে বেসামাল কচি গাছের ডালের মতো কাঁপে'-তে 'বুড়ি' ও 'কচি' শব্দদুটির তীব্র বৈপরীত্য-উৎসারিত করুণতা আমাদের বিদ্ধ করে; মানবিক বাস্তবতার কুশ্রীতা আদিম নৈসর্গিক শুদ্ধতার উপমা-অনুষঙ্গে কাব্যিক সুন্দরের অর্ঘ পায়।

তেয়াত্তর

'শ্মশানছবি' সপ্রতিভ চাতুরীর একেবারে স্পর্শবিমুক্ত গভীর হৃদয়াবেগ ও অনুভূতির অভিব্যক্তি ঃ 'সৌর-শ্মশানের বুকে শীলমোহরের মতো জেগে থাকে সেই দৃশ্য : / মায়ের মুখাগ্নি করে সন্তানের অকৃতজ্ঞ হাত।' 'গোলাপের প্রতিদ্বন্দ্বী' ও 'দংশনের অনুষ্ঠান'-এর মতো কবিতায় অবশ্য যৌনতাই প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছে।

'কলকাতা' নবপর্যায় পঞ্চম বর্ষ ॥ দ্বিতীয় সংখ্যায় রণজিৎ দাশের যে চারটি কবিতা প্রকাশিত হয়েছিল তাতে স্মার্টনেশ বা সপ্রতিভ বাচনের তির্যকতা কমে আবেগস্পন্দিত প্রত্যক্ষতা অনেকটা আসে ; যৌনতা, কবিতার স্পন্দনে আরো কেঁপে ওঠে। 'ফসিল' কবিতায় যখন রণজিৎ এই আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করেন : 'মৃত ফোয়ারার পাশে তোমার নগ্নতা আজ, অন্তত, বিচ্ছুরিত হোক।'—তখন জেগে ওঠে এক শরীরী শুদ্ধতার মায়া। 'শিক্ষিকা' কবিতাটিতে যদিচ যৌনতা প্রবেশ করেছে তার তীব্র ধ্বংসোন্মুখ আচ্ছন্নতা নিয়ে, কিন্তু 'পিকনিকে যাবার পথে' কবিতায় এক রহস্যময় শঙ্কিল আবহ-নির্মাণে তা লীন হয়ে গেছে। 'মোটর গাড়ির ছায়া গাছে গাছে লেপটে আছে—/এই পথ অভিসন্ধি জানে।'—অভিসন্ধিপরায়ণ পথের এই ইঙ্গিতে প্রথমেই একটা আতঙ্ক-ছড়ানো রহস্যময় আবহ আভাসিত হয়। তারপরেই সর্বনাশ, ভয়, গোপনতার দ্যোতনা বয়ে আসে এমন আশ্চর্য মৌলিকতায় দীপ্ত উপমা : 'আমরা ভেবেছি, যাবো পিকনিকে, সূর্যাস্তের টানে যাবো/দিগন্তের কাছে,/যেভাবে বণিক যায় দক্ষ বাজারের দিকে—অগ্নিবীমা সিন্দুকে লুকিয়ে ;।' তারপর যৌনতা : 'আমরা ভেবেছি, এই পথে, এই পথে পথে, রঙিন উল্লাসে উড়বে/কিশোরীর চুল, স্কার্ট—যৌনসন্ধি পতাকার মতো' ; সবশেষে ফিরে আসে আবার সেই শঙ্কিল আবহ রহস্যের আরো গাঢ়তা নিয়ে : 'কিন্তু যতো স্পিড বাড়ে, সেদ্ধ ডিম, পাঁউরুটি, মুগঁর খাঁচার পাশে/অদ্ভুত আতংক বেড়ে ওঠে/মোটরগাড়ির ছায়া গাছে গাছে লেপটে আছে—স্পষ্ট দেখা যায়।' 'কৃষ্ণপক্ষ' সংকলন ৫, অক্টোবর ১৯৮২'-তে প্রকাশিত 'অন্তর্ঘাত' কবিতায় রণজিৎ যখন বলেন : 'শরীরের ছিদ্রগুলি দিয়ে আমি উঁকি মেরে দেখেছি, ভিতরে শিরাধমনীর জালে আটকে আছে একখণ্ড রক্তাভ আকাশ'—তখন নিছক শরীরের বাহ্য বাস্তবতা ছাড়িয়ে ভেতরের রক্তপাত ও দূর দিগন্তের অসীমতা, গহন ও ব্যাপ্ত, একই সঙ্গে আভাসিত হয়ে ওঠে।

প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'বালি ও তরমুজ' বইয়ের কবিতাগুলিতেও কবিতার কারিগরির ওপর নিশ্চিত নিয়ন্ত্রণ দেখিয়েছেন ; তবে তাঁর উচ্চারণে সপ্রতিভতার ভাগটাই যেন বেশি, অন্তর্গত রক্তক্ষরণ বা সেই অমোঘ ভিতর-টান তেমনভাবে চোখে পড়ে না। 'অরণ্য প্রার্থনা', 'মধুপুর মধুপুর', 'আদা ও জাহাজ', 'প্রেমত', 'খেলা',—এই সব কবিতায় শুধুই স্মার্ট চটপটে বাচনভঙ্গিমা পাই। 'খেলা' কবিতায় তো এই সপ্রতিভতা একেবারেই লক্ষভ্রষ্ট হয়। 'সংবাদপত্রের ছায়া' কবিতায় কিন্তু এই সপ্রতিভতার সঙ্গেই একটা সন্ত্রাসের আবহ আভাসিত হয়ে রচনাটিকে একটু তুলে ধরেছে। এবং 'কালোধোঁয়া' কবিতায় আভ্যন্তর রক্তক্ষরণ আর চাপা থাকে নি : 'শহরে চলেছি এই রাতের গাড়ীতে, কর্মস্থলে/যেখানে অনেক ধোঁয়া, ধোঁয়ার আড়ালে অর্থ, মাসমাইনে/আমি মাসে মাসে রেখে আসি গ্রামের বাড়ীতে/তিন দিন

পরে ফিরি, যেমন ফিরছি/হে ধোঁয়া, হে আমার পোশাক, নিশ্চিন্তে আমাকে 'খাও/ পথিমধ্যে এই প্রতারণা, এই হাওয়া, এই জ্যোৎস্না। এই শালবন/এখানে পেচ্ছাপ করছি, কেঁপে উঠছে প্রত্যঙ্গ আমার/এ সুখকম্পন থেকে আমাকে বাঁচাও আমাকে মাইনে দাও, কালো ধোঁয়া, অন্য কিছু ভালই লাগে না,'—এই ছদ্মবাচনে আত্মবঞ্চনা ও আত্মপীড়নের আর্তি মর্মস্পর্শী হয়ে ওঠে ; নিসর্গমাধুরীর নস্টালজিক, উদাস-করা শুদ্ধতা ও বিস্তারের বর্ণনার মধ্যে 'পেচ্ছাপ' এই লৌকিক শরীরী শব্দটি আশ্চর্য খাপ খেয়ে যায়। 'এ সুখকম্পন থেকে আমাকে বাঁচাও' বলতে গিয়ে বক্তার গলার কাছে ঠেলে ওঠে বাষ্প, ভেতরটা হিম, ফাঁকা লাগে, বেশ বুঝতে পারি। 'প্রেম ২'-তে একটা সরল উচ্চারণের মায়া রয়েছে। এর তৃতীয়/চতুর্থ পঙ্‌ক্তিতে একটু সপ্রতিভ কৌশল থাকলেও তা প্রকট হয়ে উঠতে পারে না। আর শেষে 'আমাদেরও বয়েস বাড়বে আর ছেলেকে পাঠাতে হবে স্কুলে'—এই বিবৃতিতে অনিবার্য সেই মন-কেমন করা বাতাস বয়ে যায়। 'গ্ল্যাক্সো বেবী' কবিতার উচ্চারণে সপ্রতিভতা, এমন কি চাতুরীও হয়তো বা একটু ধরা পড়ে, 'আমাদের বাচ্চা বড়ো কালো হয়,/ধূপকাঠির মতো সরু হাত পা, আলুর মতো মাথা/নায়েগ্রাপ্রপাতের মতো নাক থেকে শুধু সিগ্নী ঝরে'—এমন বর্ণনায় ক্লিন্ন বাস্তবও সরাসরি উঠে আসে, আর 'ইচ্ছে করে, শুয়োরের বাচ্চাদের দিই পেটে পা ঢুকিয়ে'-তে বিতৃষ্ণার প্রকাশ হয় স্থূল ও সোচ্চার, কিন্তু কবিতাটির সামগ্রিক অভিঘাত তাতেই সীমাবদ্ধ না থেকে শেষে 'এসো বেবী স্বপ্ন থেকে উঠে এসো,/হাওয়া হয়ে ছুঁয়ে যাও, মেঘ হয়ে ভেসে এসো/বৃষ্টি হয়ে ঝরে পড়ো বেবী আমার বৌ-এর কোলে, একমাত্র হয়ে ঝরে পড়ো।'—এই প্রার্থনার সহজ আন্তরিকতায়, অসহায় আত্মগ্লানি ও স্বপ্নের উন্মোচনে, গহনস্পর্শী হয়ে ওঠে। 'জাতীয় জরীপ দিবসের গান' কবিতায় স্ফূর্তির মেজাজ ও সতেজ উপস্থাপনভঙ্গি ব্যঙ্গের তীক্ষ্ণতাকে লক্ষ্যবেধী করেছে : 'হোহো আজ জরীপদিবস আজ শুধু মাত্র মাপামাপি হবে,/কে যে কাকে মেপে নেবে/কেউ জানিবে না শুধু গাওয়া হবে গান/ একসূত্রে মাপিয়াছি সহস্রটি প্রাণ।' 'ডাকবাংলোর প্রেম' কবিতায় কবির স্বপ্নকল্পনার ছোঁয়া ডাকবাংলোকেও সজীব চেতন সত্তা : দেয় 'কবে এক কবি এসে থেকেছিল দিনদুই গেয়েছিল গান তার জন্য আজও/কবে সে আসবে তুমি তারপর দিকে দিকে ফোটাবে পলাশ।' 'যুদ্ধের পরে' কবিতায় প্রসূন আন্তরিক উপলব্ধি ও নিপুণ বর্ণনার গুণে সর্বাত্মক শূন্যতার এক হিম অনুভূতিকে আমাদের মধ্যে সঞ্চারিত করে দিতে পারেন, ফুটিয়ে তুলতে পারেন 'ভাঙা টিউবওয়েলের পাশে পড়ে আছে ছাতা' এমন অমোঘ দৃশ্যচিত্রে ধ্বংস ও রিক্ততার অদম্য হাহাকারকে। 'মফস্বলের বাস' কবিতায় কবির বর্ণনার সজীবতা, অনুপুঙ্খ উপস্থাপনের তীক্ষ্ণ নৈপুণ্য, সীমান্তিক্রমী নিসর্গ ও সীমাবদ্ধ মানুষকে যুগপৎ ছুঁয়ে, সামগ্রিক অভিঘাতে, এক সহজ নস্টালজিক মায়াকেই ছড়িয়ে দেয় : 'পশ্চিমের শালবন, লালমাটি, মহুয়ার গন্ধ ভেঙে বাস ছুটল দূরে/পশ্চিম বাংলার বাস, খরা, রুক্ষ টিলা ভেঙে/খোঁড়া, অন্ধ ভিখিরীর গানে গানে, বেলা থেকে অবেলায়/ইঞ্জিনের শব্দ তুলে, পোড়া পেট্রলের মেঘে বান্দীপাড়ার/দুপুর মথিত করে, গরুরগাড়ীর ঝাঁক সযত্নে পেছনে রেখে/বাস ছুটল ঐ, দূরে ঐ/সূর্য ডুবল

ধানের গভীরে, আর হাত নাড়তে গিয়ে বালকের/খুলে গেল ধরে থাকা প্যান্ট।'

'কবিতা ৭৮-৮০' আর 'ঋক্ষ মেষ কথা'—এ পর্যন্ত এই দুখানি কবিতার বই বেরিয়েছে সুবোধ সরকারের। সুবোধের স্বরভঙ্গি সম্পর্কে কখনই 'স্যার্ট' বিশেষণটি প্রয়োগ করতে ইচ্ছে হয় না। তবে তাঁর উপস্থাপন অবশ্যই বুদ্ধি-প্রোজ্জ্বল, গহন অনুভূতি আর মননতীক্ষ্ণ সচেতনতার লক্ষণীয় সমবায়ে উদ্ভাসিত তাঁর সৃষ্টির ভুবন। 'কবিতা ৭৮-৮০' এবং 'ঋক্ষ মেষ কথা'-র কবিতাগুলির মধ্যে মেজাজ, রূপকল্প এবং বিষয়কল্পনার ক্ষেত্রে বৈষম্য বেশ প্রকট হয়ে উঠেছে। বলা বাহুল্য-এর মধ্য দিয়ে সুবোধের পথ খুঁজে ফেরার ঐকান্তিকতা, স্বরক্ষেপণের এক বিস্তৃত ক্ষেত্র অধিকার করে নেওয়ার আত্মপ্রত্যয় ও সাহস প্রতিপাদিত। 'কবিতা ৭৮-৮০'-র কবিতাগুলির উচ্চারণ বেশ কিছুটা খোলামেলা, ছড়িয়ে দেওয়া, ফ্যান্সির সজীব সঞ্চারণে, ফ্যান্টাসির আলো-আঁধারি মায়ায়, একটা অনাতপচ্ছন্ন খুশির মেজাজে, সতেজ ও প্রাণময়। এরই পাশে 'ঋক্ষ মেষ কথা'-র কবিতাগুলির বাঁধুনি আঁটো, অধিকাংশেরই আয়তন সংক্ষিপ্ত, যৌনতার বিকার ও বেদনা, 'কবিতা ৭৮-৮০'-র সহজ আলোক-চ্ছুরিত কল্পনাজগতের পাশে এক বিষণ্ণ মর্ষকামী সান্দ্র তিমিরলিপ্ত কল্পনাজগৎকে উন্মোচিত করে দেয়।

কবিতা ৭৮-৮০'-র নানা কবিতায় 'অসীম'', 'অনন্ত', 'আকাশ' এইসব প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ অসীমতাব্যঞ্জক শব্দ একটা বিস্তারিত পটকে কাব্যানুভূতির পেছনে মেলে দেয়; আর শিশু, শিশুর জগৎ, বিশেষ করে তার খেলার উপাদান বল, কখনও প্রত্যক্ষ বর্ণনায় কখনও পরোক্ষ রূপকাশ্রিয়তায় এক মৌল শুদ্ধতাকে তুলে আনে; মানবিক আত্মার নিষ্ক্রমণ এবং নিসর্গ-লীনতা ও পশু বা পতঙ্গে রূপান্তর প্রাণের অভিব্যক্তি ও বিকাশের এক আদিগন্ত আয়তন ছুঁয়ে স্পন্দিত হতে থাকে। 'বিলুপ্ত নূরণী' কবিতাটি শুরু হয় 'ভাঙা টেম্পু করে এসে পড়েছি অনন্তে'—এই যে পঙক্তিতে, তাতে 'ভাঙা টেম্পু'-র বৈপরীত্যেই বিশেষ করে যেন অনন্তের অগাধ বিস্তৃতিতে মন ছড়িয়ে যায়, পরের পঙক্তিতেই 'সাথে দিদিরাও ছিল'-র ঘনিষ্ঠ পারিবারিকতায় অনন্ত তার চারিত্র না হারিয়েও আমাদের প্রাত্যহিক অস্তিত্বের ওপর ঝুঁকে আসে। ঠিক এইরকম বৈপরীত্য পাই 'ঝাউবনে' কবিতার প্রথমে ঃ 'আছে মহাকাশ/নীচে অল্প বিছানায় তুমি শুয়ে আছো'—'অল্প' বিশেষণটি যেন আমাদের চেতনায় ধাক্কা দিয়ে 'মহাকাশ'-এর অনন্ত ব্যাপ্তি ও গার্হস্থ্যের সংকীর্ণ পরিসীমাকে তীব্র বৈপরীত্যের টানটান দুই নেরুতে বসিয়ে দেয়। 'আমি শ্যাম' কবিতায় 'বাড়ী চাষীদের বাড়ী—নেই সব ঘর আকাশে আটকানো/সকালে অনন্ত থেকে নেমে এসে মাঠে কাজ করে যায়।'—হঠাৎ ফ্যান্টাসির মায়াবী আলোয় এই যে অলৌকিকের মধ্যে প্রসারিত হয়ে যায় লৌকিক, তাতে বাস্তব পারিপার্শ্বিকতার অবলুপ্তি নয়, উত্তরণ ঘটে। একদিকে, পরিচিত দৃশ্যেই অপরিচিত আশ্চর্যতার মায়া সঞ্চার করতে পারেন সুবোধ, যেমন উনিল যৌবনের স্পন্দিত এই উদ্ভাসে, 'তার চেয়ে মেয়েটির উনিশ বছর/যার সব অন্তর্বেগ/ট্রাপে ও তরঙ্গে আটকানো' (কার্বন), তেমনি ঐ 'কার্বন' কবিতায়ই 'হে ঈশ্বর হে ঈশ্বর/বাইরে বেরিয়ে দেখি রোদ এসে পড়েছে পুকুরে/মনে

হয় রোদ জল থেকে তুলে প্লেটে করে রেখে দিই'-তে তাঁর খেয়ালী কল্পনার বিস্ময়বোধ অলৌকিককে ছোঁয়! আবার 'আমার এলিজি' কবিতায়, 'চেরীফুল ছিল/রাশি রাশি, আজ/তারা প্রিন্ট হয়ে বাচ্চা ছেলেদের গায়ে উঠে গেছে।' -তে বা 'সিঁড়ি দিয়ে উঠে এসে দেখি কুয়োতলা, মনে পড়ে গেল/কুয়োর ওপরে ছোট নীল রঙের একটা বাল্ব জেলে দিতাম আমরা/সেটা কই? যে পাখীটি আসত/সে কি খুলে মুখে করে নিয়ে গেছে ডিম ভেবে/কুয়োতলা'-য় ঐ ফ্যান্সির অভাবিত অমোঘ প্রয়োগ মূর্ত অথচ তীব্র শিহরণ জাগিয়ে তোলে চেতনায়। নির্মিতিনৈপুণ্য ও বুদ্ধির ঔজ্জ্বল্যে উদ্ভাসিত 'শিশুটি বিমূর্ত' কবিতায়—শিশু, বল, অসীম, সুবোধের 'কবিতা ৭৮-৮০'র সুপরিচিত এইসব motif—শুদ্ধতা, ব্রহ্মাণ্ডের বর্তুলতা ও অনন্ত ব্যাপ্তির ধারণাকে ছড়িয়ে দেয়। 'আত্মা, একটি বল' কবিতায় আত্মা, বল, অনন্ত—এইসব পূর্বপরিচিত motif-এর সঙ্গে রয়েছে, 'দেবদূত'-কে ঘিরে স্বতোৎসারিত ফ্যান্টাসির একটুখানি মায়া : 'আজ সেই পথ রুমে এসে/থামে মাঠের ভেতর, যেখানে দু'খানা ছোট ছোট/অপূর্ব চেয়ার রেখে গেছে দেবদূত', এবং মানুষের পতঙ্গে রূপান্তরের পুনরাবৃত্ত motif : 'আর সে মুহূর্তে আমি পেছনের থেকে নির্নিমেষ আবার আবার মৌমাছি হয়ে উড়ে গিয়ে তোমার শরীরে/বসে আবার তক্ষুনি উড়ে যাই'। 'বিনু ও ফড়িং' কবিতায় পাই আত্মার নিষ্ক্রমণ ও রূপান্তর, 'হাততালি, তারপর' কবিতায় পক্ষী-শাবকে, 'আওয়াজ, পাইন বাগানে'-তে পতঙ্গে তথা মৌমাছি-তে মানবিক সত্তার রূপান্তর। 'ডেকচির আশেপাশে' কবিতায় শিশু, তার জগৎ, আর সেই জগতের উপাদান বর্তুল ব্রহ্মাণ্ডের প্রতিরূপ 'একটি বড় ধরনের বল' 'আর মেঝে/পাশে উল্টোনো ডেকচি, পাউডার কৌটো ও চিরুনি'-তে সহজ বিস্ময়ের মায়ায় পেয়ে যাই। এর মধ্যে 'মৃত্যুদিবস : বাবাকে' ও 'বাড়ী নেই', এই কবিতাদুটিতে অপ্রাকৃত আবহ সঞ্চারে, একটু অন্য ধরনের ফ্যান্টাসি রচিত হয়ে উঠে, পৃথক মাত্রা সংযোজন করেছে। 'মৃত্যুদিবস : বাবাকে' কবিতায়, 'মাঠে গিয়ে দাঁড়ালাম সূর্যাস্তের আগে/মাঠে একটাই গাছ, পাখী নেই'—এই আপাত-নিরীহ বর্ণনায় অপ্রাকৃত আবহের কেমন যেন একটা শিরশিরে অনুভূতি জাগে; 'এখন আমরা/বেশ আছি, সামনের মাসে বাড়ী দেখে উঠে যাচ্ছি/চলুন পারলে—মার সঙ্গে মজা করে আলাপ করিয়ে/দেব, চিনতেই পারবে না।'—এর আপাত-'মজা-র প্রচ্ছাদন সরে গিয়ে, অশান্ত কলহমুখর অভাবের পুরোনো দিনগুলিতে যে পরিবার-প্রধান উপস্থিত ছিলেন এখনকার আপেক্ষিক সচ্ছলতার দিনে তিনি নেই, এই উপলব্ধির অন্তর্নিহিত বিষাদ এবং দুরতিক্রম্য বিচ্ছিন্নতার বোধ এবং 'চিনতেই পারবে না'-এর মধ্য দিয়ে নিজের সবচেয়ে অন্তরঙ্গ জনের কাছেও কারো আইডেন্টিটি হারিয়ে যাওয়ার বিধুরতা আমাদের বিদ্ধ করে। 'বাড়ী নেই' কবিতায়, 'আমাদের বাড়ী ছিল, যদি গিয়ে দেখি বাড়ী নেই—মাঠ/মা বলে ডাকতেই নাক নেই, চুল পুড়ে গেছে/কেউ বেরিয়ে আসেন/যদি কেয়ার পা পড়ে থাকতে দেখি?/কেয়ার পা/দীঘিতে ডুবিয়ে, মনে আছে, কেবল নাড়াতো!'—এই অংশটুকু তো বটেই, 'তারপর দেখি শনশন করে/গাড়ী ছুটে আসে। সাদা ধবধবে গাড়ী। প্রায় না থামার/মতো

থেমে আমাকে নিমেষে তুলে নিল।'—শেষের এই অংশটুকুও ফ্যান্টাসির মধ্যে macabre-এর আভাসকে ধরে রাখে।

'ঋক্ষ মেষ কথা'-র কয়েকটি কবিতায় যৌনতার বিকার তার অন্তর্লীন বেদনা নিয়ে ভাষা পেয়েছে। 'যশ' কবিতায়, 'স্ত্রী চেয়েছিলাম / স্বপ্নচারী সহকর্মী এক / আজ রাতে দেখি তার স্ত্রীগহ্বর ও মুখগহ্বর এক হয়ে গেছে।' স্বপ্নভঙ্গের এই স্বীকৃতির পরে কবি শরীরের ক্লেদ ও জীবনের গ্লানিময় দিককে এইভাবে বরণ করে নেন ঃ মল, মূত্র, পুঁজ, অর্থ, কাম / প্রণাম প্রণাম।' 'ব্যভিচার' কবিতা শুরুই হচ্ছে বিকার ও ব্যাধির এই সটান স্বীকারোক্তি দিয়ে ঃ 'প্রভুপত্নীর সামনে দুবার মৈথুন করার পর—আমার একটি পায়ে পচন ধরে যায়।' 'আমি পূর্ণ' কবিতায় পাই এমন প্রতপ্ত বিকারগ্রস্ত যৌনকামনা ঃ 'আমি যেন ভোরবেলা উঠে দেখি উষার আলোর নিচে আমার স্তনের জন্য হাহাকার পড়ে গেছে, পিতা ও পুত্রের মধ্যে।' 'আপনার দাসী' কবিতায় ওই যৌনতারই দেখা মেলে, তবে 'এক টাকা' কবিতায় ওই যৌনতার বিকারের সঙ্গেই মিলেছে জিঘাংসার বীভৎসতা। 'মড়কের আগে' কবিতায় পাই ওই যৌনতার বিকারের সঙ্গেই সংশ্লিষ্ট ব্যাধি ও পাপবোধের স্বীকারোক্তি ঃ 'মুখের এপাশে ফেটে যাওয়া গণোরিয়া/আজো লম্পট, লোভী আমি, পাপে ভারী হয়ে আসে পা'। 'অপরাধস্পৃহা'য় ওই যৌনকামনার সঙ্গেই জড়িয়ে থাকে অপরাধচেতনা ঃ 'অশ্ব থেকে নেমে তিন যোদ্ধা এসে বলে আন ওকে ধরে আন / মোতিঝিলে—তবে এরা তিনজনে একসঙ্গে অর্থ খুঁজে নিক / আমাকে বলাৎকার করে।' 'নব-দম্পতি' কবিতায় যৌনতার বিকার চরম জুগুপ্সাব্যঞ্জক হয়ে ওঠে ঃ 'রাতে তাকে চুমু খায় আর ওয়াক তোলে। / দৃষ্টি ভরে দেখে তবু গামলার মতো দুটি কুৎসিত স্তন।' 'কবিতা ৭৮-৮০'-র 'মৃত্যুদিবস ঃ বাবাকে' কবিতায় পিতৃচরিত্রের যে বিচ্ছিন্নতা, দ্যোতিত তাই 'ঋক্ষ মেষ কথা'-র 'ষাট ষাট ষাট', 'অশ্রু জরায়ুতে', 'এ দেহ পিঞ্জর', 'সন্তানের মতো', এই চারটি কবিতায় তীব্র যৌনক্ষুধা, ব্যাধি, মত্ততা, অপরাধবোধের গ্লানির সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে গূঢ়, জটিল ও মর্মবেধী হয়ে উঠেছে। 'ষাট, ষাট, ষাট' কবিতায় অবশ্য বিষয়ের কেন্দ্রে স্থিত না হয়ে প্রসঙ্গতঃ এসে যায় পিতৃচরিত্রের এই যৌনব্যাধির বর্ণনা ঃ 'রক্তে ভিজে গেছে বেডশীট, মা বাবাকে জাপটে ধরে কাঁদছে আর বলছে :/ এ কি রোগ তুমি নিয়ে এলে / এ বংশে! কত নম্বরে গিয়েছিলে?' 'অশ্রু জরায়ুতে', 'এ দেহ পিঞ্জর', 'সন্তানের মতো'—পরপর এই তিনটি কবিতায় ওই পিতৃচরিত্র বিষয়ের কেন্দ্রেই অবস্থান করেছে।' 'অশ্রু জরায়ুতে' যৌনসম্ভোগের প্রবল উল্লাস নয়, তীব্র বেদনাই অভিব্যক্তি পায় ঃ 'পিতার শিশ্ন থেকে রেতঃপাত নয়/ চোখের গরম জল ঝরে পড়ে ফোঁটাফোঁটা তার জরায়ুতে।' 'এ দেহে পিঞ্জর'-এ পরোক্ষে দেহের 'সীমা ছাড়িয়ে যাওয়ার আঁতিই দ্যোতিত হয়েছে : স্ত্রীর দিক থেকে / দৃষ্টি তুলে নিয়ে সন্ধ্যাকাশ দেখে ভাবতেন : এ দেহ পিঞ্জর!' আর পরাবাস্তবের এই উদ্ভাসে উত্তরণের অধ্যাসই (illusion) সংকেতিত ঃ 'উনি দেখছেন জ্যোতির্ময় আলো, পরমার / সে কি রূপ ড্রাগনের পিঠে চড়ে ছুটে চলেছেন, চোখ ঢাকা।' এবং সবশেষে নিঃসীম শূন্যতার হিম

অনুভূতি জাগিয়ে গহন চেতনায় অনুরণিত হতে থাকে ঃ 'বাতাস উঠেছে আজ বাতাস উঠেছে ফের গভীর বাতাস।' বইয়ের শেষ কবিতা 'সন্তানের মতো'-য় ওই পিতৃচরিত্রের চরম মত্ততার গ্লানি ও বেদনা যেমন একদিকে মূর্ত ঃ 'অমরাবতীর থেকে বিষণ্ণ খবর / এল কাল রাত্রে মাঠে বাবাকে উলঙ্গ হয়ে পায়চারীরত / অবস্থায় দেখা গেছে ;', তেমনি ঐ চরিত্রের পরম প্রিয়জনের ত্রস্ত ও সংকুচিত চিত্তের কাতরতা যেন চরাচরে ব্যাপ্ত হয়ে যায় ঃ 'পরপার / থেকে বোন ও মায়ের কান্নার গোঙানি উঠে আসে ;'। এই বিকার, ব্যাধি ও ক্লিন্নতার মধ্যে অন্য দিগন্তের ব্যতিক্রমী ইশারা বয়ে নিয়ে আসে 'অন্য বসুন্ধরা' কবিতাটি। এতেও রয়েছে যৌনতার স্পর্শ ঃ 'ভেনাসের উরু/শিরিশ দিয়ে ঘষে রজোগুণ উসকে নিই' ; কিন্তু কবিতাটির পরিণামী অভিঘাত এক নির্জন প্রশান্তির ঈপ্সিত আশ্রয়ে পৌঁছে দেয় ঃ 'গুহার ভিতর দিয়ে মাথা নিচু করে / দুই, তিন, চার মাইলেরও দূরে এসে দেখি ঃ অন্য বসুন্ধরা / শান্ত ঝর্ণা, জনহীন—গিয়ে বসি একশো ছেলের হাত ধরে।' অবশ্য এ ব্যতিক্রমই ; সুবোধের ব্যাপ্ত নৈসর্গিক প্রতিমায়ও ব্যাধিত দেহের ক্লেদ সঞ্চারিত হয়ে যায় : 'শুকনো গুঁড়ি ধরে আততায়ী কাঁদছে আর দূরে পুড়ছে টায়ার / পেছনে দগদগে, চুলকে চুলকে রক্তঝরা ক্ষতের মতো দিকচক্রবাল / এই দুই দৃশ্যের মাঝখানে এসে দাঁড়িয়ে পড়েছি' (ষাট, ষাট, ষাট)। grotesque-এর প্রতি সুবোধের যে অনতিপ্রচ্ছন্ন প্রবণতা মাঝেমাঝে ধরা পড়েছে, তারই চরম দৃষ্টান্ত পাই : 'হিজড়েরা হাতে চেরীফুল নিয়ে বাড়ি বাড়ি নবজাতক নাচাচ্ছে / তাদের কুৎসিত মুখে সানগ্লাস' (গাভীর শৃঙ্গার), এমন বর্ণনায়। 'কবিতা ৭৮-৮০'-তে পশু-পক্ষী-পতঙ্গে মানবিক সত্তার রূপান্তরে ফ্যান্সির সহজ উৎসারই প্রধানত লক্ষণীয়, কিন্তু 'ঋক্ষ মেষ কথা'-য় তা অনেক গূঢ়-জটিল তাৎপর্যে ঋদ্ধ হয়ে alienation বা বিচ্ছিন্নতার তীব্র বোধকেই দ্যোতিত করে তুলেছে। 'বৃংহণ' কবিতায় প্রথমে সমস্ত প্রিয়জনের কাছেই যে এই রূপান্তর ধরা পড়ে গেছে তার অনুপুঙ্খ বর্ণনা রয়েছে। সবশেষে, ঐ রূপান্তর যে দুরতিক্রম্য বিচ্ছিন্নতাকেই অনিবার্য করে তোলে তারই মর্মান্তিক স্বীকৃতি পাই এই বিবৃতিতে ঃ 'আপাদমস্তক কালো কম্বল জড়িয়ে আমি কাঁদতে কাঁদতে—আমি বৃংহণ করতে করতে ছেড়ে এসেছি তোমাদের লোকালয়।'—এর মধ্যে 'বৃংহণ করতে করতে'-তে এই রূপান্তরের স্পষ্ট সাক্ষ্য যেমন ধরা রইল, তেমনি 'আপাদমস্তক কালো কম্বল জড়িয়ে'-তে আইডেণ্টিটি গোপন করার লজ্জা ও আত্মগ্লানি এবং 'ছেড়ে এসেছি তোমাদের লোকালয়'-এ সমাজ থেকে চরম বিচ্ছিন্নতা প্রকট হয়ে উঠল। 'ঋক্ষ মেষ কথা'-শীর্ষক নাম-কবিতায় মানুষের এই পশু-রূপান্তরই নিহিত দ্বৈতসত্তার, ঘাতক ও বধ্য, পরস্পর-বিপ্রতীপ এই দুই ভূমিকা গ্রহণে যেন বা, অন্য এক মাত্রা পায় : 'আয়নার সামনে এসে দেখি মানুষের না, আমার মাথা এক মেষের / আয়নার সামনে এসে দেখি মানুষের না, আমার মাথা এক ঋক্ষের'। আর শেষে বিকার ও ক্ষয়ের বাহক হয়ে 'কুঁজের অগাধিত মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসছে কীট'/সুবোধের কবিমন যে গূঢ় ও বিমিশ্র জটিলতার সন্ধানী, শাদা-কালো বিভাজনের প্রথাসিদ্ধ প্রকটতার পথে তা যে সন্তরণ করে না, তার

একটি প্রোজ্জ্বল নিদর্শন মেলে 'দুজন দ্রষ্টা' কবিতায়, যেখানে 'আমার মৃতদেহ নিয়ে চলেছে শকট / পেছনে দুজন দারোগা, ঠিকালদর্শী' ও 'আমার মৃতদেহ নিয়ে চলেছে শকট / পেছনে দুজন পুরোহিত, অপমানিত, বধির'—এই দুটি পঙ্‌ক্তি-যুগ্মকে 'ঠিকালদর্শী' ও 'অপমানিত, বধির', এই বিশেষণত্রয়কে অপ্রত্যাশিত ব্যত্যয়ী অন্বয়ঙ্গে উপস্থাপিত হতে দেখি।

সুবোধ সরকারের এই সচেতন শীলিত, সূক্ষ্ম ইশারাসন্ধানী উচ্চারণের পাশে নির্মল হালদারের কবিতাকে মনে হবেই নাঈভ, স্বভাবপন্থী। আকাঁড়া গদ্যের ঋজু সারল্যে নির্মল মৃত্তিকাসংলগ্ন সহজ প্রাণধর্মকে ছুঁতে চান। নির্মলের প্রথম বই 'অস্ত্রের নীরবতা'-য় তাঁর উচ্চারণ প্রায়শই দ্যোতনারিক্ত একমাত্রিকতাকে শুধু ছুঁয়ে থাকে, সারল্য বিপজ্জনকভাবে তুচ্ছতার ধার ঘেঁষে যায়। তবু 'গরীবের শিল্প', 'নগরকেন্দ্রিক', 'আত্মকথা', 'গোপাল ও বাঁশি', 'এলোমেলো জীবনযাপন'—এইসব কবিতায় সবকিছু ছাপিয়ে অনন্বীকার্য একটা সোঁদা গন্ধ উঠে আসে, অব্যবহিত গ্রামীণ পরিবেশের সতেজ আবহ সঞ্চারিত হয়। আর 'গরীবের কাঁথাকানিতেই প্রমাণ আছে / গরীবের শিল্পবোধ' (গরীবের শিল্প), 'আমি আছি ঢে'কির শব্দে গরুর গাড়ীর শব্দে' (নগরকেন্দ্রিক), 'আমার গল্প / কাড়া বাগাল গরু বাগালের মুখে' (আত্মকথা), 'আমি তবে বহুদের বলি : চিরুনি কেন / হাওয়া এসে চুলে বিলি কেটে যাবে, 'আয়নাই বা কেন / আমার মুখ দেখবে জলে', (এলোমেলো জীবন-যাপন)—এইসব উক্তির নিরাভরণ সারল্য ও নিসর্গলীন মুগ্ধতা এবং 'কী আশ্চর্য / ভারতবর্ষ সেই কবে গোপালের হাতে দিয়েছে বাঁশি, ক্ষিদে পেলেই সুস্বাদু সুর।' (গোপাল ও বাঁশি)—এমন অনতিসোচ্চার কটাক্ষ আমাদের কিছুটা স্পর্শ করতেও পারে। তবে 'অস্ত্রের নীরবতা', 'টাকা', 'মানুষ', 'যই', 'পায়রা', 'তিনি'—এইসব লেখায় নির্মলের আঘাতপ্রবণ স্পষ্ট বিবৃতি স্থূলতায় পীড়িত। 'প্রেম' কবিতায় অবশ্য নির্মল সহজ বিস্ময়বোধের অভিব্যক্তিতে অমোঘ কবিতাকে নিশ্চিত ছুঁয়ে যান। কিন্তু অন্যত্র 'জাস্ট এ মিনিট একটা ফটো' (বাবুমশাই আমি নির্মল হালদার), 'এবং আমার সম্মুখে ভালোমানুষ কেন / সে তো রেখ্‌ট জানেন, অজিতেশ জানেন', (শূন্য বোতল), 'তাঁর কাছে ফল চেয়ে ক্যাডবেরি পাইনি কোনোদিন' (মৃত্যু—পৃঃ ৩৫)—এইসব উচ্চারণে শহুরে সপ্রতিভতার চোরাফাঁদে ধরা দিয়ে তিনি স্বধর্মভ্রষ্ট হন। আবার 'আমাকেই ডাকো', 'পয়সা', 'মায়ের হাঁ', 'মূর্খের দেশে'—এইসব কবিতার কথা বিশেষভাবে মনে রেখে বলা যায় যে 'অস্ত্রের নীরবতা'-র নির্মলের স্বরোৎক্ষেপ কদাচ আবহমান কবিতার অন্তর্লীন স্পন্দন ও অভিঘাতে দুলে উঠেছে। সেদিক দিয়ে নির্মলের দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'পুরনো এ জীবন আমাদের নয়'-তে একটা নিশ্চিত অগ্রসরণ সূচিত। 'নিয়ে এসেছি / রক্ত-মাংসের উত্থান / নিয়ে এসেছি মাটির নম্রতা থেকে / আমাদের বিনয়'—এই প্রারম্ভিক বাচনেই তাঁর স্বর অনেক সংহত, সতেজ ও আত্মপ্রত্যয়ী লাগে। তার পরে, 'কেউ সন্ধ্যেবেলায় বেড়াতে বেরিয়ে / ধূপের গন্ধের সঙ্গে ঘামের গন্ধ পায়' (আছি),—মানুষের প্রতি এমন শ্রদ্ধাপূত দৃষ্টি ; 'আমার শরীরে জেগে উঠলো গাছপালা—প্রকৃতির স্নেহ' (আকাঙ্ক্ষা)

—এমন নিবিড় নিসর্গমগ্নতা ; 'আমরা গান গেয়ে ধান কেটেছি কাল / আমরা গান গেয়ে ধান কেটেছি আজ', (আমাদের জীবন)—এমন আবিষ্ট অনুরণনময়তা ; 'চাষীরা ঘরে ফিরছে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরছে' (সামগ্রী)—এমন অনাবিল বিস্ময়বোধ, 'ঘরের বাইরে কি ক'রে যাই / ঘরই নেই আমার।' —এমন মুক্ত প্রাণের সহজ স্বীকারোক্তি ; 'আর / কুয়োকে ঘিরে যে বাথরুম, তার গায়ে লেখা :/বাথরুমে আমার সমুদ্রস্নান / তুমি আরও হাসবে / হাসিটুকু আমরা চাই। (আমাদের বাড়ী)—এমন আটপৌরে সজীব হার্দ উচ্চারণ, আমাদের বেশ কিছুটা নাড়িয়ে দিয়ে যায়। 'এখনও' কবিতায় 'কয়লাকাটা মানুষ মাটিকাটা মানুষের সঙ্গে দেখা'-য় 'আরও কতো গভীরতা' খুঁজে পাওয়ার সম্ভাবনার কথা জানান নির্মল। 'আধার' কবিতায় 'ছোনাচের ধুলো ওড়ানো ছন্দে' লাফ দিয়ে নিজের 'দেশের মূল' দেখার তথা আপন আন্তস্বের মৌল শিকড় সন্ধানের ঐকান্তিক অকৃতি তিনি ব্যক্ত করেন। 'রুস' কবিতায় মাটির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংযোগের মধ্যেই একটু দূর কল্পনার ছোঁয়া লাগে : 'জানলা খোলা থাকবে দরজা খোলা থাকবে / আমি দৌড়োতে দৌড়োতে সংগ্রহ করবো সৃজনের দিনগুলি / যা পড়ে আছে নদীর দু'পারে'। বইয়ের শেষ কবিতার শিরোনাম, 'সূচনা', অবশ্যই তাৎপর্যবহ। এই কবিতাটিতে নিসর্গ, মানুষ, পশু, কীট, বড়ো ছোট সব কিছুর মধ্যেই শুশ্রূষা ও সৌন্দর্য আবিষ্কারের এক সহজ উদার বিস্ময় আস্তীর্ণ হয়ে আছে। আমার প্রত্যাশা, আঞ্চলিক মাটি ও পারিপার্শ্বিকতাকে অঙ্গীকার ক'রে, আদিম লোকসঙ্গীতের শুদ্ধ সারল্যকে টেনে নিয়ে ভবিষ্যতে নির্মল তাঁর কাব্যোচ্চারণকে আরো শক্ত শিরদাঁড়ার নির্ভরতায় দাঁড় করাবেন।

কলীকৃষ্ণ গুহ

৪ মার্চ ১৯৮৩

কথা হ'লো।
চারপাশে অদ্ভুত শূন্যতা, ক্যালেণ্ডার, এ্যাসট্রে, গোপাল ঘোষ, ঝুলঝাড়া টিন···
এরি মধ্যে কথা হ'লো।

—'একদিন পাশাপাশি ব'সে এককাপ কফি খাওয়া যাবে'
—'একদিন পাশাপাশি ব'সে হয়তো এককাপ কফি খাওয়া যাবে'

—'জীবন দীর্ঘ কিনা বুঝতে পারি না'
—'জীবন হয়তো দীর্ঘ নয়, শীত রক্ত মৃত্যু রয়েছে'

—'ঘর থেকে বারবার মানুষের মিছিল দেখেছি'
—'বটপাতা নেমেছে মিছিলে'

—'হয়তো আর দেখাই হবে না'
—'হয়তো দেখা হবে না কখনো'
—'বাইরে বিকেল হয়ে এলো'
—'বাইরে হলুদ আলো নেমে আসছে গোপন ভয়ের মতো ; এসো, লক্ষ করি ।'

এই কথা হ'লো আজ—৪ মার্চ ১৯৮৩।

বিশ্ববিদ্যালয়

এইখানে বিশ্ববিদ্যালয়।
এইখানে দেবদারু, ঝাউ, ছায়া ফ্যালে

এইখানে অনীত-কে বেছে নেয় ঘুন চোখে স্বল্পবাক্ দেবযানী সোম—
এখানে পাণ্ডুরদিনে চিঠি উড়ে আসে।

এখানে বাতাসে ভাসে পাখি, মেঘ, ঋতুচক্র, গান···

জল

তরুণ বন্ধুর সঙ্গে শহরের জলাধারে যাই।
জল দেখি।
অমোঘ বিকেল—সমস্ত শরীরে ছায়া, মৃতি, নম্র কোলাহল।
'বস্তুত জলের কাছে যেতে হলে সমুদ্রের কাছে যেতে হবে' ব'লে
তরুণ বন্ধুটি যেই তাকালো আমার দিকে
আমি তাকে 'এও তো সত্য জল' ব'লেই অনেক কাছে,
আরো কাছে গিয়ে জল ছুঁই।

তারপর শুরু হ'লো কথকতা, মৃত্যুদীর্ণ কালো কথকতা।

রঞ্জন সরকার

কুষ্ঠাশ্রমের হাওয়া

১.
বঞ্চিত আলোর দেশে চুঁয়ে চুঁয়ে জ্যোৎস্না নেমে পড়ে···
কয়েকটি নক্ষত্রও উঠেছে আজ!
শুভলক্ষণ! বুঝে বাইরে এসেছি···খোঁড়ল পেরিয়ে যাই চার হাত পা-য়ে
তারপর চারপাশ হারাতে থাকি দ্রুত।

আমরা যারা বেঁচে থাকবার জন্যে বেঁচে আছি এতকাল—
দূরে দূরে গুটিয়ে গুটিয়ে শুয়ে আমাদের লম্বমান কুকুর বসতি।
তারও পরে খাড়ি ও লবণ গন্ধ···
আমরা হারিয়ে যাই খুব দ্রুত
কুষ্ঠাশ্রমের হাওয়া বয় এই দেশে, আমাদের দেহ জুড়ে দিনে দিনে পুষ্টিশীল কুষ্ঠ
ঝরে পড়ে

গ্রহাণ্ডলে এতাবৎ কোন মানুষ নেই···
উত্তপ্ত জ্যোৎস্নালোকে আমাদের হৃদয়ে কিঞ্চিৎ প্রতিশব্দ হয়
কিঞ্চিৎ অদ্ভুত শব্দে আমরাও কেঁপে উঠি, নড়ে যাই
তখনই দূর পাল্লায় শহুরে মিনারগুলি ধরা পড়ে
আমাদের চারপাশের ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ঘোলা জলে আমরা সেই শহরের
ছায়া চেটে খাই।

দুপাশে কুকুর চরার মাঠ, ফাঁদ—ফাঁদই জীবন
দালাল মদ্যপ নেশাড়ু, ও ভিখিরী কুকুর এখানে অনর্গল, এখানে অনন্তকাল
ঘুমিয়ে চলে

এই বঞ্চিত আলোয়, দেশটি বড়ই প্রাচীন
তাদের মধ্যে আজ খোঁড়লের বাইরে দাঁড়িয়ে আমি কেঁপে যাই।
মাঝে মাঝে স্মৃতি ফেরে—
সে কি প্রভু ? তখন তাকাই, দেখি
আমাদের কণ্ঠাজিত জীবনের কোলাহল ইনাম করে মিনার শহরটি জেগে আছে।
আমাদের বঞ্চিত স্বপ্নগুলি বোকা, ঘাড় গুঁজে পড়ে আছে মাঠে
কুণ্ঠাশ্রম থেকে গান আসে, আর—
তখনই আমার নিজেকে নিঃসঙ্গ বলে মনে হয়।

মনে পড়ে আমরা আমাদের মুণ্ডুহীন ছায়া সঙ্গে করে কুয়াশায় ঘুরেছি এতদিন
প্রগাঢ় জ্যোৎস্নায়—পার্কে, বেঞ্চের নিচে আমাদের দামাল সন্ধ ! সামাল সামাল···
রাজরোষ লেগে যাবে।
কবে যেন আমাদের সমস্ত হাত পঙ্গু করেছে
পাথরে প্রলিপ্ত কাদার সমুদ্র তীরে আমাদের পদছাপ পদছাপময় মিশে গেছে।
শুধু পবিত্র মৃত! খিস্তি আর যৌনতাময় ভুলের স্বদেশে আমাদের ঘা-য়ে পুঁজ ঝরে গো
শুধুই অস্পষ্ট স্বপ্নের ছবি দেখি
শুধুই তোমার স্মৃতির স্বপ্ন, বল তবে এ কোন নরক ! তবে কেন অনালোক বল

দীর্ঘ অক্ষর ও তামসী রাত জেগে থাকে এই গ্রহে···
শহরময় ঘোরাঘুরি করে গানের হিন্দি কলি, গন্ধ গোলাপ
আর আমরা হল্লা গড়িয়ে দিই তাতে—
আর আমরা হারিয়ে যাবার কথাও ভাবি, হারিয়ে যাবার পথ খুঁজি
কোনদিন আকাশ পরিষ্কার হয়
কাম্যভেজা মড়া চাঁদ আকাশে এলিয়ে গিয়ে দেখে—
পৃথিবীর কুঁকো ছায়া আর আমাদের প্রকৃত মুখ··· ।
জ্যোৎস্নাকে তখন একাকী নিঃসঙ্গ বলে মনে হয়

২.
কতকাল পরে এই বিস্ফোরণ হল
প্রসারিত হল ভাঙা হাত।
নিজেকে নিঃসঙ্গ মনে হল খুব···
মনে পড়ল জীবনের গল্প, রতনের মার কথা মনে হল।
ল্যাংড়া ভবিষ্যৎহীন স্রোতের অতীতশব্দ, আর জরির খোলের মত তা থেকে কোথাও
ছিটিয়ে গেল জ্যোৎস্না

আমাদের পুতুল দেহ সে আলোয় ঘোরে ফেরে, যৌন প্যামফ্লেট ছাপে—
গোদার ও রাঁদার ছবি···মাঝে মাঝে সভাটভা, রাজনীতির দারুণ চমক
নিরন্ন পুরুষকীট বারান্দায় বারান্দায় ঝিমোয় ম ঝরাতে
নেশাগ্রস্ত হয়, একা একা কুঠে ভোগে। কুষ্ঠ ক্রমশ তাকে কুকুর বানায়
ঘরবাড়ীহীন সন্তানেরা আজও তবু গান গায় প্রতিষ্ঠান গড়ে।

নিরন্ন জ্যোৎস্না আজ আমাকে দেখায় এসব
ক্রমশ চীৎকার করে উঠি···কাকে ডাকি ?
গলাতেও সাড় নেই। নিজেকে তাকিয়ে দেখি ভাল করে···
শিরদাঁড়াহীন লোমে ঢাকা কে এ ?
জীবনের তুচ্ছ পলতে একটু উসকে দিই, দেখি—
সাড়া নেই···সাড়া নেই·· কোনখানে। বাঁচার সড়ক আছে কোনখানে ?
দিতে পারো ? নির্ভেজাল শুধু বাঁচা, ভালবাসা পুঁজ নেই দিতে পারো ?
একথা বলেছি আর চমকে গিয়েছি ভয়ে
আমাদের রতনের বুক ভেঙে ইঁটপাজার বুকে লাল রং চমকে গিয়েছে
জটী সন্ন্যাসীর বাচ্চা ভাইবোন, পাথুরে সাততলার নিচে ওড়াচ্ছে ছাই, ধুলো
জ্বালানী মুক্তো আর আঁচের আগুন

আমি বহুদূর থেকে এসবই দেখেছি
আর নিজেকে নিজের ভীড়ে হারিয়ে ফেলেছি
থুতু আর বিষ্ঠার ভীড়ে হারিয়ে বসেছি বারবার।
তারপর শুধু হিম, হিমে ডুবে গেছে সব···
লাভ স্রোতোময় আকাশে তাকালে তবু দেখি জেগে আছো তুমি
তুমি একা···
আর তোমার চোখের থেকে রক্তবিন্দু ঝরে ঝরে ডেকে যাচ্ছে এ ধুলোর দেশ,
—এ কঠিন কুকুর প্রান্তর

মন্দাকিনীর পথ ঘুরে চিঠি আর আসে না-গো
তবু কুয়াশায় হয়রান আমি ব্যর্থ খুঁজি···তবু খুঁজি
স্বপ্নময় মিছিলে শহর পরিক্রমা সেরে মৃদু ও নিঃশব্দ পায়ে ঘর খোঁজ করি।

৩.
তুমি কোনদিন ভুল কোরে আমাদের এই শহরে পা দাও
ভাবি, তুমি কোনদিন ভুল কোরে খেলার ভুলের মত, ফেলে আসা স্টেশনে দাঁড়াও।
এই পিগমীদের বিরুদ্ধ বাতাসে
এ অসীম রক্তের ধোয়া আর কুয়াশায়···
তুমি ভুল কোরে এ ক্ষুধার্ত অরণ্যে, এ মাটির শব্দে ফিরে এসো।
আমরা তোমায় দেখি, আবার তোমাদের দেখে বিশুদ্ধ দিনের কথা ভাবি

এ নির্জন পাথুরে প্রান্তরে, রোদে আমাদের মুখ পুড়ে গেছে, সেও কতকাল হল
বাতাস প্রশাখাগুলি আন্দোলিত করে দেয়…
সে বাতাস পারদের, লৌহের, কুয়াশা ও রক্তে মাখামাখি
ভোর আসে বিহ্বল। বছর বছর যায় ঘুরে
সে কি ভোর ?
দেখছ কি ? ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় আমরা অপেক্ষায় থাকি
শুধুই অপেক্ষায় কেটে যায় বছর বছর
তুমি কি এখনো এসব জান, বোঝ, নামো সেই পথে

তবু আমাদের জন্ম হয়। বিষনীল পেটে, অন্ধ শিশু আসে
পোলিও রোগের শিশু ভূত ও ভাতের স্বপ্নে ককায়, তাদের পাঁজরে ঘুণ পড়ে।
আজও আমি ভাবি। তোমার কথাই তবু ভাবি
এই স্টেশনচাতালে, এইটাকা ও বমির স্বর্গস্তূপে, এই পুঁজ আর স্তনমাংস রান্নার আগুনে
যে মেয়ের চোখ পুড়ে যায়,
তার চোখে জল হয়ে ঝর তুমি। আর সারা আকাশের মুখে ঝরে পড়ে
দাক্ষিণ্য ও ক্ষমা
মায়াবী আলোয় মাঠের বৃষ্টিতে ভেজে যন্ত্রমানুষ, রঙশূন্য গরু, গামছা হাতে
ল্যাংটো জেলেরা
ভেজে চাষী বৌ-র শূন্য সাদা থান
আমাদের চীৎকার আক্রোশ আদর্শ ভিজে ভিজে ফ্যাকাশে ভিখিরি হয়ে পড়ে
সাদা পাখী উড়ে যায় তাই থেকে—এতো সাদা, দিনে দিনে আমরা সদয় অন্ধ হই।
ওগো, কত দূরে তুমি আর কিছুই দেখি না
আসলে রাতের চেয়েও ঢের কালো এ আকাশে যদি চাঁদ ওঠে—
মেঘের মিনার থেকে আমাদের ঘোড়ামুখ জলে কেঁপে উঠতে দেখে
ভয় পেয়ে সরে আসি
আর সাপ ও হরিণ নিয়ে, শিকার ও শিল্প নিয়ে সন্ধ্যাস্বপ্নে মেতে ওঠে যৌনসভ্যতা।

৪.

ভাবি, তোমরা কিভাবে থাকো…
আজ এতদিন পর কোনকিছু ভুল সংকেত হয়তো বা হবে, তাও মনে পড়ে
মনে পড়ে প্রতারিত ছোটবেলা, খাটুনে মায়ের মুখ, তোমার গহন স্নেহ
আর তুমি স্পর্শ দিয়ে দিয়ে চলে যাও…
কোন টানে এসেছিলে সেইদিন, গাছেরা ফিসফাস বলে
আমি পার হই সবই একা
আর ভাবি, তুমি ভুল কোরে এ ভুল অরণ্যে ফিরে এসো—
এ ভুলের মাটিতে দাঁড়াও।

যত সন্ধ্যা নেমে আসে, যতদূর দিগন্তের দিকে আলো নেভে—
আমাদের শেষ সত্য, জীবনের শেষ কোলাহল চুরি করে নিয়ে যায় চতুর গৃধিনী
নিম্ন অঞ্চলের দিকে। আমাদের স্থবির স্বপ্নগুলি নাভিশ্বাস ফেলে
সেইখানে হাড় ও হাড়ের রেণুতে পুর হয় মাটি। চকিত চন্দ্রালোক পিছলে পড়ে
কঙ্কালে হাওয়া খ্যালে, স্বস্তি পাই ; অতলে পালাই
তেমন অতলে গেলে মনে পড়ে প্রেতস্তব্ধতার দেশ…

আমাদের কষ্টার্জিত কবিতা কল্পনাগুলিও কখনও সখনো মনে পড়ে
মনে হয় নীল জলে শেওলার গান
আর সমস্তই ঠিক আছে কেবল পুরো জীবনটাই গুঁড়ো গুঁড়ো
শ্মশান কঙ্কালের পানে উড়ে চলে পাতা, ধুলো
আর সমস্তই ঠিক থাকে কেবল পুরো জীবনটাই গুঁড়ো গুঁড়ো।

এতোল বেতোল ল্যাংটো ছেলেরা চরছে মাঠে।
এটাই সকাল আর সূর্য ভীতু ও নরম তাকিয়ে
আমাদের চারপাশে ঘুরে যাচ্ছে, ধান স্বপ্ন হাওয়া ইরিগেশনের জল, সেচনালা,
পুতুলের কুঁড়ে
নোংরা ফুঁসে জেগে ওঠা কেজো চিমনি ধোঁয়া ওগলাচ্ছে মাঠে
আমরা কজন ভূতে পাওয়া শা জোয়ান ; আমাদের দেখছে সবাই
এই ঘূর্ণী হাওয়া জল ও আকাশ, চাষী-বৌ, কুষ্ঠরোগী, বেশ্যামেয়েটি, আর—
মৃতগন্ধ পেতে থাকা এক বুড়ো, চারপাশ থেকে আমাদের তারিয়ে তারিয়ে দেখছে
আর আমরা ক্রমশ অনুভব করছি নাভি পুড়ে যাওয়ার খিদে…
খিদে থেকে অখিদের উদাসীনতা, ভাসানের পোস্টারের ছবি, ডিম—শুক্র অজস্র ভুলবর্ণ
সব কিছু নিয়ে শহর জয় করে ফিরেছি আমরা !
তবু মেরুদণ্ডে রাত্রি লেগে আছে
তবু মনে পড়ছে ফের, প্রেতস্তব্ধতার দেশ, নীল জলে শেওলার গান এবং…
তোমার স্বপ্নময় চিঠি

৫.

ময়লা মেঘ গড়িয়ে গড়িয়ে রুপোলী সূর্যরেখা কখনো সখনো আমাদের
কিছু কাছে আসে।
অন্ধকার পুরোনো কারশেড থেকে উড়ে আসা সাদা পায়রা সেইদিন—
ওভারহেড লাইনে নজর মেলে দ্যাখে, কার লাশ, কোন তরুণের শুকনো রক্তে
রেললাইন কত লাল হল
কতখানি-প্রিয় ছিল ও
প্রতিটি পাতাবাহারের হলুদে সবুজে আমাদের শৈশবের গন্ধ লেগে থাকে

চিরকালীন হাওয়া বয়। রোদ ও আকাশে মাটিতে ধুলোয় বিভোর, ক্লিষ্ট দেহগুলি
একই লক্ষ্যে পাক খায়, অবিরাম একই মেরুতে
যেমন আমিও ঘুরি, ধর্ম অর্থ কাম, অমরত্ব গিলে এবং অনেককিছু সকলেই জানেন।
তবুও জলের বুকে বোঝা মাছরাঙা কোন কোনদিন একা ফাঁকা করে
কিছুকাল বিক্ষিপ্ত অরণ্যে মেষ চরে, জাংলা ফুটো হয়ে নামে খোঁড়লের মুখে
সারারাত অনিবার্য বসে আর কপাটে মুখ গুঁজে পড়ে থাকা—
এই কালোত্তীর্ণ প্রেম, যুদ্ধ একান্ত অভিলাষ
সারাটা জীবন এই নীল কাদা ওগরানো যৌন পিল পেয়েছি বলেই ভুলি,
ভুলে যাই সব।

সমস্ত উৎসমুখ থেকে কলতানি বেরোয়
কারখানা ঘর থেকে ধর্মে শস্যে উৎসবের মাতাল ধোঁয়ায় কেঁপে ওঠে
সঙ্ঘর্ষবিহীন সভ্যতা।
অবাধ চর্চা চলে শহরে গ্রামে, ল্যাবরেটরী ফিল্ম ও কালিতে
বিশ্ববিদ্যালয় নামে প্রসূতিসদন থেকে মগজ ও খুলিতে রঙিন যন্ত্র ঠেসে
আমরা বাইরে আসি
রঙিন পৃথিবী দেখি, মীন-পুষ্প-আঠা ও গলিত পুঁজের
তখন আমাদের সমস্ত দেহে জ্বর···
ভোর বেলা উঠে দেখি আদিগঙ্গা লাল। রক্ত ছিটিয়ে আছে ভোরে
ভেসে যাচ্ছে আমাদের স্বপ্ন, স্মৃতি ; মেধাভার, সমস্ত জীবনের পরিশ্রম
বুড়ীর কোলেরটা, বেশ্যা ও ধর্ষিতা গলা জড়াজড়ি করে গলে যাচ্ছে চোখ মেলে
কাক, চিল এইসব প্রকৃত পাখি বিষণ্ণ আনন্দ গান গায়
আর আমরাও উন্নত সভ্যতায় নামি ফের, ডুবে যাই ; শরীরে শিল্প খুঁজি
আড়ালে আড়ালে টুকটাক রাজনীতি। দীর্ঘ দীর্ঘকাল এসবই গল্প চলে···
রাজদরবার থেকে অনেক অনেক রাতের বাসে পিষ্ট ন্যাবাগ্রস্ত ভূতের দল
লুকিয়ে চুরিয়ে ফিরে দেখি, আমার জীবন···
আমারই মেয়েকে নিয়ে দু-দল প্রহরী যুযুধান ; সাট্টা, চাট সোডার বোতল
এবং পুলিশও
ঝুম নামে···
আর সারারাত আমরাও প্রাণ বার করে দোব বলে খোঁড়লের মুখে বসে থাকি।
আমাদের ফাঁকি দিয়ে রাত পার হয় মায়া-ট্রেন, দুর্নিরীক্ষ্য চাঁদ, আমাদেরই
নিটোল গ্রাস, ক্ষুধার্ত দেশ।
শুধুমাত্র অতি উদ্যমে আমার ভাই এর বুকে ছোরাছুরি চলে যায়
আর আমরা সাহসে অক্ষম করি ধুলো, ধুলোর পৃথিবী
কেউ জেগে আছি ?
কেউ কাউকে জানিনা। শুধু এক অন্ধমিছিল বের হয় রাতে···
শুধু এক অন্ধদের অন্ধ মিছিল ঘুরে যায় অন্ধকার সারা দেশ জুড়ে

অজ্ঞাতবাস

৬.
তবু স্বপ্নের দেশ মনে পড়ে। যেখানে এখনও চাঁদ থামে কিছুকাল···
যেখানে রয়েছো তুমি, আছে ভিজে যাওয়া ডালপালা, সঠিক বাড়ীটি
আমাদের এদেশে রাত জ্বলে ওঠে বুকে / এবং ঘুম আসে
দগ্ধ যন্ত্রণায় খাটালের পাশে পয়ঃপ্রণালী, বারান্দার পাশে কেউ কেউ মড়া হয়
তবুও কোথাও কোথাও ঠুকঠাক শব্দ হয় / কোথাও কোথাও কাজ চলে
কে যেন জ্বালানী সংগ্রহ করে এবং জ্বালায়···
আমরা চার হাত-পায়ে খোঁড়লের বাইরে দাঁড়িয়ে তাদেরই জন্যে হাত
উঁচু করে রাখি ॥

দুটি কবিতা

পার্থপ্রতিম কাঞ্জিলাল

যোষিৎ

১.
মাঝে মাঝে আমাকে বেপাড়ায় দেখা যায়। বলা দরকার যে পুরুষদের বেশ্যাগমনে যেহেতু সমাজের মৌন সমর্থন আছে, সেই কারণে এই অঞ্চলকে আমার নিষিদ্ধ মনে হয়নি ; এছাড়াও, অভাবীদের সঙ্গে যৌনতা হয় না—খ্যাতিহীন কবিদের স্ত্রীরা প্রায়ই যা বুঝে ওঠেন। তা-ও, আমাকে বেপাড়ায় বা সংলগ্ন এলাকায় দেখা যায়।
মাঝে মাঝে দুটি একটি স্বভাবী রমণী এসব পাড়ায় আসে। একবার একজনের খবর পেয়েছিলাম, আর দশটি ভিন্নভিন্ন রাজনৈতিক দলের সক্রিয় যুবকর্মীদের পাঠিয়ে ছিলাম তার কাছে। পরে নিজে তার কাছে যাই। সেদিন দুপুরে খুব বৃষ্টি। খুব জেদ নিয়ে জানতে চাই—শুধু জানতে চেয়েছিলাম দশজনের তফাৎ কী কী। কে কীভাবে। কিন্তু সে এমনি ধূর্ত যে খালি সঙ্গম করতে চায়। প্রায় দেড়ঘণ্টা কাটিয়ে কথা না বার করতে পেরে উঠে আসি। চা খেয়ে ধাতস্থ হয়ে আঁচ করি যে ওসব করলে হয়তো তারপর জানা যেতো—যদিও, লিপ্ত হ'লে, ওসব জানতে ইচ্ছে না-ও করতে পারতো, (যেহেতু আমি তখনো কুমার) সে সম্ভাবনা-ও ছিলো।
আমি পরে তাকে পাইনি, জায়গা বদলেছে। কিন্তু তারই মতো কাউকে আমি খুঁজছি—আরিয়াডন, তোমার কাছ থেকে ঐ উলসুতো না পেয়ে ভারতবর্ষের গভীরে যাবার মতো সূত্রতান্ত্রিক আমি নই, আরিয়াডন, যদি দেখা না দাও, সুতো না দাও, আমি এই জীবন নিম্নরাজনৈতিকতার সিন্ধুবালির গর্তে থেকে যাবো

উননব্বই

২.

হাটখোলার কাছাকাছি গিয়া সে প্রথম তারুণ্যের চোখে কয়েকটি মেয়েকে দেখিতে পায়, ফ্রক পরিবার বয়স উত্তীর্ণ হইয়াও যাহারা ফ্রক পরিয়াছে, সিগারেট খাইতেছে, অবহেলিত অসংস্কৃত শৌচাগারে একটি নতুন প্লাস্টিকের মগ থাকিলে যেরূপ দেখায় তেমনি তাহাদের প্রসাধিত রূপ ; কয়েকটি ছোপ-লাগা মোটা উরু, ফ্রকের উপরকার মলিন ফুল দেখিয়া সে বোঝে ইহারা বেশ্যা—লোকে ইহাদের লইয়া আমোদপ্রমোদ করে কিন্তু সতর্ক চোখে তাকায় যেরূপ ইহারাও লোককে গ্রাহ্য না করিয়া আমোদ পায়, কিন্তু, লোককে সতর্ক-দেখিয়া, ঘরে নেয়।

'তবে তোমাদের ধর্ম কি, তোমাদের মনুষ্যত্ব কি যদি এরকমই চলে।'

পণ্ডিতেরা তাহাকে গ্রন্থলিখিত কারণগুলি বুঝাইয়াছিলেন, সে বোঝে নাই, সে জানাইয়াছিল, মানুষকে এতোটা হীন ভাবিতে সে পারিবে না। সে অসুস্থ হইয়া পড়ে, জ্বর প্রবল বেগে উঠে এবং মধ্যরাত্রে সে লক্ষ করে জ্বরতাপের সহিত কামতাপও সমান তীব্র! অন্ধকার ঘরে তখন এক বৃদ্ধ আসিয়া বলে, 'তোমার তো প্রথম তারুণ্য, তাই তুমি দেখিতে পাও না যে যখন তোমার এই বয়স থাকিবে না, তখন চিরনতুন থাকিবার আকাঙ্ক্ষা কিরূপ বাড়িয়া উঠিবে। কে বৃদ্ধ হইয়া চিরজীবিত থাকিতে চায়? বালক, বেশ্যাদের সংসর্গেই একমাত্র চিরতারুণ্য রহিয়াছে যেহেতু তাহারা খাদ্য, জল, পথ, নদী তথা পৃথিবীর ন্যায় নৈর্ব্যক্তিক। শোনো, মানুষ হীন নয়, মানুষের অদৃষ্টই নীচ, ইতর ও স্ত্রীলোকস্বভাব ; তাই নীচ ইতর স্ত্রীলোকের সহিত সংসর্গ করিতে হয়, অর্থ, মানুষ তাহার অদৃষ্টকেও প্রসন্নমনে গ্রহণ করিল। স্ত্রীলোককে বেশ্যা হইতে হয়, পুরুষকে বেশ্যাগমন করিতে হয় কেননা ইহা ছাড়া অদৃষ্টকে স্পর্শ করিবার আর কোনো অজ্ঞান প্রণালী নাই।' তদবধি দেহজীবিনীরাই তাহার প্রণয়িনী, সে তাহাদের নিকট যাক বা না যাক।

দুটি কবিতা

বীরেন্দ্রনাথ রক্ষিত

যাবো ধূলাবাড়ি

এখনই বিকেল হয়ে ফুরিয়ে-যাবার কথা কেন ওঠে, কেনই বা রোদে
দীর্ঘশয়ান ঐ ছায়াটির সঙ্গে এসে পড়ে—
সমস্ত দিনের সেই অফুরান ঘেমে-ওঠা, রগড়, ঘড়ির শব্দ, টাকা… ?
বোতাম-হারানো হৃৎপিণ্ড থেকে, একবার জামার
কাছে, খড়কুটোর মতো মনে হলো ; আবার, তামাশা

অজ্ঞাতবাস

ব'লে, খুব দূর-থেকে, গাধাদের বিদায়বেলার চিৎকার
আসে ভেসে ; হলো মেলামেশা-দিয়ে একটি পুতুল-তৈরির
কারখানা। মনে মনে—অনেক জমেছে খুচরো, বৃষ্টির মতন
অনেক লেনদেন, কবে খরাশেষে—দুএক পশলা
ভিজে উঠবার চেয়ে কেন-আরো নিঃশব্দে ক্ষরণ
আসে ? শুধু চিং-হয়ে শোবার মতো জমিজমা, বাস্তুনির্মাণ—
ওকে আজ ছায়া ব'লে হাঁক পাড়ে, রোদ বা কমলাঘন তার
ঘুমের পোশাক, আমরা ভিক্ষে-চেয়ে নেবো,
যদি—ফুরিয়ে না যায় সেই হাঁকডাক,
হাত-পেতে, পাথরের চেয়ে ভারি বুকের অতলস্পর্শে যাবো ;
যাবো ধূলাবাড়ি, বিকেল-হবার আগে-আগে।

ঘুমের আগে

কাল ছিলো ব্ল্যাকআউটের রাত
কোনো এক ছদ্মবেশী লরি তার বাঘের গর্জনে চলে-গেলে
এই নিঝুম উপত্যকার মেষপালকেরা
সম্ভবত, দেশলাইহীন শূন্য পকেটে—ঘুমিয়ে পড়ে।

ঘুমিয়ে, বালবাচ্চাদের শরীরের অধুনালুপ্ত ওম
তারা স্মরণ করে
ও দুঃখিত হয় ; দুঃখ
মেষপালনের সামাজিক দায়-সম্পর্কে :
কে নাকি কবে নদীর জলঘোলা-ক'রে, এখন
উপকথাবর্তী নেকড়ের বিষনজরে !

ঘুমের এই একপাল ভেড়া…
যা ঘুমভাঙা নিশ্চয়তায়, কেবল ছালচামড়াটুকুই পারে দিতে !
তার বেশি দেওয়া,
হয়তো শুয়োরের বাচ্চাদেরও সাধ্যাতীত।

তবু, কাল ছিলো ব্ল্যাকআউটের রাত…
ঘুমের আগে, উপত্যকাবাসীদের
নিশ্চয় পেচ্ছাপ সেরে নিতে হয়—
ঐ আঁধার রাতটাকেই একটা আস্ত গণ্ডার মনে ক'রে।

একানব্বই

দুটি কবিতা

নিত্য মালাকার

মজবুড়োর আপন দেশ : ১

এখানে রাত্রি বড়ো অন্ধকার

এখানে তেমন কবিত্ব নেই বর্ণসুষমাও নেই প্রকৃতির
একদল বাবু এসে কলের লাঙল নিয়ে বলাৎকার ক'রে গেছে
ধরিত্রী ও ঊষাদের
তাই আকাশ গভীর সুনীল নয় বনানী বেহায়া
নদীতে থাকেনা মাছ—বাঁজা বড়ো শুধুই ঝিমোয়
কূলে কূলে গাইত যারা বৈতালিক
শহরে আকাশবাণীর দেশে এখন মজুর খাটে
হুমদো রুগ্ন বাচ্চা কোলে
সুতরাং···
আকাশ যেমন ক'রে গায় আজো বর্ষার জোছ্না রাতে
কলাবাগানের মাথায় ঝিলিমিলি করে
রক্তজবা কলিজার আরতিবন্দনা
তার কথা কে মনে রেখেছে আর

মজবুড়োর ছিলিম নিবেছে কবে তবু বেটা এখনো তেমনি
কিচ্ছায় হাসাবে মাতাবে সব বাচ্চাদের বাবুদের

এখন এখানে অনেক পথ—
শিরাউপশিরা বেয়ে স্মৃতিবিস্মৃতির টান,
তবু চলকে ওঠে—
ঐ উদোম ছেলেটি যার নামেরও পোশাক নেই দরকারী
কোরা বা ডাউকী ডাকলে অতল জলের
মীননাথ গায় গান—কান পেতে শোনে।

চোখ, অশ্রু

দ্যাখো, আমি কিছুই লিখছিনা, লিখতেই পারছিনা।
চোখে জল এসে গেলো ভাবতে ভাবতে ;

তুমি তো দেখছোই কী ঘটে গেলো অইখানে,
অইখানে বুড়িধরলার জল এসে থেমে গেলো
আর, মরুবালুরাশি স্তূপ স্তূপ সাজানো মল্লিকার ভুরু ;
ধনুকের ছিলায় তীর কাঁপলো কিছু কাশবন,—
বুড়িধরলার জল আজ দুধসায়রের দেশে
নেমে গেলো মোহগর্তে,
সহস্র শৈবালদলও থিতু হয়ে জানালো প্রণতি।

আমি কিন্তু বুঝে উঠতে পারিনি এখনো,
কোথায় রূপক ছিলো ? আসল গল্পটা তবে
কন্দরেই ঘটমান, বহিঃপ্রকাশ নেই, জল হলো ?
তুমি তো দেখছোই আমি কী রকম কেঁদে নেয়ে
তোমাকেই ধরতে চেয়ে শুধুই তোমাকে,
বারে বারে হাওয়ায় ভাসিয়ে তুলেছি এই লাল ওষ্ঠ,
সপ্তপর্ণী শমীবৃক্ষে চূড়ায় উড্ডীন শব্দ
—ধ্বজা, কথামালা
ধাতুর অণুর ক্ষয়ে বহে গেলো কতোকাল
ফোঁটায় ফোঁটায়
স্বাতী নক্ষত্র থেকে ঝরে পড়া অভিমান,
তুমি জানো, দ্যাখো সব—
আমি কিছুই লিখছিনা।

তিনটি কবিতা

স্নেহাশিস্ শুকুল

সূর্যোদয়

মাঝেরহাট ব্রিজের উপর থেকে সূর্য ডুবতে দেখে
যে লোকটা ঈষৎ ঝুঁকে দাঁড়িয়েছিল রেলিং ধরে
তাকে আমি চিনি
কথা বলিনি তার সাথে ওভাবে চুপচাপ মাঝব্রিজে
একা দেখে তাকে

তিরানব্বই

কিই বা বলার আছে, নিঃসঙ্গ মানুষ, হয়তো ক্লান্ত
হয়তো বাড়ী ফেরার পথে বাস থেকে সূর্য ডুবতে দেখে
এমনি নেমেছে, একেবারে অকারণ

তারপর সূর্যের টুকটুকে লালবল হয়ে যাওয়া দেখে
সবে তিনে পা দেওয়া মেয়ের বায়না পড়ে গেছে মনে

একটা লালবল এনে দিও বাবা
সূর্যের মতো লাল

মাঝেরহাট ব্রিজের উপর মধ্যবিত্ত বাবা মনে মনে
কথা বলে মেয়ের সাথে

লালবল চাসনা মামন
আমি তোকে সূর্য এনে দেবো একদিন দেখিস
মাঝেরহাট ব্রিজের খুব কাছাকাছি
সূর্যের বাসা ॥

স্মৃতিকথা

আর ঘরের ভেতর ফিরোজা বেগম আচমকা গেয়ে উঠলেন
নিরজনে সখি, এবং তখনি
আর নিরজন ভালো লাগে না রে ভাই, একটা সময় ছিল
বলেই লাল লাজুক হয়ে উঠলেন সেই বৃদ্ধা
সমস্ত পাপড়ি মেলে ধরলো যেন পদ্ম আর সমবেত শ্রোতারা
আশ্চর্য এক পেটিকার কারুকাজ দেখে মুগ্ধ
অতীত সুগন্ধে ভরে উঠলো ঘর
এবং সবাই কেমন ভুলে গেল আশ্চর্য পেটিকা বা তার কারুকাজই
সব নয়
আরও আছে প্রকাশের অপেক্ষায়
অথচ সেই বৃদ্ধা তখনো বলেন নি কিছু নিরজন ভালো না লাগার
কারণ
যেন বারণ সেই কথা বলা অথবা তেমন কিছুই নয়, শুধু ভয়

কস্তুরি নাভি বুকে যে পেটিকা রাখা আছে
তা যদি শূন্যগর্ভ হয়, তাই ক্ষণেক বিরতি
এবং অবশেষে কাল থেকে কালান্তরে হেঁটে যান তিনি
তাঁর কথা বলার ভঙ্গি, ব্রীড়ায় বিদেশী শিল্পীর তুলি
ওঠানামা করে
এবং সবাই অবাক হয়ে শোনে তাঁর খুব নরম করে বলা
কোন এক ইংরেজ রমণীর গল্প
কেমন মমতায় তাঁর হাতে তুলে দিয়েছিলেন সেই রমণী তাঁর
মৃতস্বামীর শখের বেহালা
সে গল্পে ভেসে ওঠে ভারতবর্ষ আর তিনি লাজুক হয়ে বলে ওঠেন
সে বেহালা আমি বাজাতে পারিনি রে ভাই একদিনও
যতোবার ছড় টানি ততোবার সুরের বদলে হাতে লাগে রক্ত
বলেই তিনি চুপ করে যান
এবং সমবেত শ্রোতারা খেয়াল করেন সুর ও রক্তের মাঝে
এক নারী কেমন একলা হয়ে পড়েন
ভীষণ অনিচ্ছায় ॥

জন্মদায়িনী

এতো খিদে যখন তখন গুবরে পোকা ধরে খা বাবা
আমার মাথা খা, লোকজন ভর্তি ডবলডেকার বাস খা
সোনা আমার, নতুন চালের ভাত আর চাসনে

এই দেখ বুক, দুধ নেই, ঐ ফোকলা মাড়ি দিয়ে আর কতো
কামড়াবি বল, ব্রহ্মতালুও ঝনঝন করে ওঠে রে পাগল
এক এক কামড়ে
বাপ গেছে বনগাঁ মাণিক রে আমার
আমি আছি পড়ে তোরই জন্য
আমাকে আর খাসনে

পায়ে পড়ি, চুপ কর রাক্ষস
বাপ এসে বানাবে ফাঁদ, চাঁদ ধরে দেবে, নাহলে
এ ফুটপাথে পা ছুঁড়ে কাঁদ যতো খুশি

যতোই কাঁদবি তুই দেখবি
ভাতের ফেনের মতো কেমন জ্যোৎস্না গলে গলে পড়ে
আহারে, অমন সুন্দর চাঁদ কি আর মাটির হাঁড়িতে ধরে
ধরে না বলেই রাখলাম আমি তোকে
তোরই কপালে
এমন কপাল বাছা চাঁদও ঢাকা পড়লো
এক চিলতে কাজলে

এতো ভাত-খিদে ভালো নয় বাবা, কথা শোন
বুকেও বিনে পয়সার দুধ নেই এমন যা দিয়ে ভেজাবো ঠোঁট তোর
শরীরে শুধু পড়ে আছে শিরার গভীরে কিছু রক্ত এখন
যেমন মজা নদীর বালির তলায় থাকে জল, তেমনি
খুঁজে নে বাছা গোপন উৎস সেই রক্তের
যদি জল হয়ে গিয়ে থাকে তা এতোদিনে
তাও বিনে পয়সায় পাবি
ঠোঁট ডুবিয়ে তৃষ্ণা মেটা রে ছেলে, বাপ গেছে বনগাঁ
বলে গেছে ফিরবে বিকেলের রেলে
ততোক্ষণ বেঁচে থাক
তারপর ফিরে এলে বাপ শুধু ঠোঁট দুটো তুলে বলিস তাকে
মায়ের রক্তের স্বাদ না মিঠে, না নোনতা
ভীষণ পানসে ॥

দেবারতি মিত্র

যমজ কবিতা

১. ঈশ্বর মিল পেন

স্বপ্নে হীরে জলের গেলাসে হীরে
দেখে ছ্যাঁৎ করে ওঠে চোখ।
ধুলোপড়া বইপত্র মাথা দিয়ে ঠেলতে ঠেলতে আমি
পোকাকাটা অক্ষরের মতো সম্পূর্ণ অদৃশ্য হতে চাই,
সে কিন্তু তখনো থাকে

উরুর চামড়ায় ঘাম
কবন্ধ মূর্তির গলা ঘিরে নীল ওলটানো কলার
আমি হার খুলে দিতে যাই—
হে হে হে হে হো হো হো হো শব্দ করে হাসে
দাঁত নেই ঠোঁট নেই।
ঘুম ভাঙলে, জানালায় ফাঁপা বুক
লোমকূপ থেকে ঝাল সোরা ঝরে নাল ঝরে
বন্ধ ঘরে গান গেয়ে উঠতে গেলে
বাটালির মতো থাবা গাল টিপবে, গলা টিপবে
ভাবি খুব মজা হবে, ফুর্তি হবে
কাঁঠালি চাঁপার ভূত গন্ধের চাকা হয়ে
ঘুরবে সারা ঘর

তার আগেই, কই মাছের মতো ওর আধকোটা হৃদপিণ্ড
ধড়ফড় চেঁচিয়ে উঠল—
তিন পা এগিয়ে দ্যাখ!
হাত ছিঁড়ব, পা ছিঁড়ব
দড়াদড়ি ছিঁড়ে তোকে কুয়োয় ফেলব ভোরবেলা।
কোথায় ফেলবে আর,
আরো নিচু কোন্‌খানে?
যার মাথা নেই মুখ নেই জানে সেই
জলের গেলাসে হীরে তো দূরের কথা
একবিন্দু জলও কি আছে?

স্বপ্নে হীরে জলের গেলাসে হীরে—
খোঁজ পেয়ে যেই আমি কথা বলতে যাই
তখনি হারমোনিয়ামের সাদা হীরের মতন রিডগুলি
সব ঝরঝর খসে গেল—
বাকি থাকে মূক সম্পূর্ণতা।

সেগুন গাছের বনে কাঠের উপর শুকনো কাঠ
গাছ চেরাইয়ের শব্দ প্রক্ষিপ্ত এখন,
বিদেহ ফুলের গন্ধ সোজাসুজি দেখতেও দেয় না
পাতার ম্লানতাগাঢ় আঁধারের নিচে
আদিম ফুটকিতে আঁকা অসমাপ্ত দু-তিনটি হরিণ
শুধুই বৃষ্টির মতো,
পিছনে পিছনে অস্ত্র ফেলে কাঠুরের দল
এল স্মৃতিচিহ্নহীন।
আরো নিচু, বেশি ঢালু, টলমল নিরুচ্চার বন
গাছ ও পাথরমাটিবালিসুদ্ধ অ-আঁকা ছবিটা
মুছে যায় পৃথিবীর অন্ত্রের ছায়ায়—
লাভায় লালসা স্নেহে চাপ খেতে খেতে
আমার প্রথমবার অর্ধনারী জন্মের আগেও
টুকরো টুকরো বন
আজও স্বপ্নে হীরে জলের গেলাসে

তাপস রায়

পুরুষ

অর্ধেক পুরুষ নিয়ে বাইরে বেরোও তুমি
আর অর্ধেক পুরুষ লুকিয়ে রাখো রাত্রির
কাগজ ও কলমের গোপন রতিক্রিয়ার জন্য
তোমার এ দুই পুরুষের মধ্যে আপাতত কোন
বিরোধ নেই, যেদিন তা দেখা দেবে, সম্পূর্ণ
সংঘর্ষে জ্বলে উঠবে আগুন, আর তৃতীয় পুরুষের
জন্য রাখা দৈত স্বপ্নবীজ পুড়ে ছাই হয়ে যাবে

মানসরঞ্জন ভট্টাচার্য

শয়তানের কাছে

ষোড়শোপচারে দেখ যা চেয়েছ সবই দিয়েছি।

নষ্ট মেধা ভ্রষ্ট স্মৃতি। জ্বলে আছে
অনির্বাণ পাপের প্রদীপ।
উপচারে লোভ ও মোহ
মাৎসর্যের গন্ধ স্রাবে আমোদিত দিব্য চতুর্দিক।

আমি প্রার্থী
আমার বাঁ দিকে বসে লুব্ধ পুরোহিত
কমণ্ডলু স্পর্শ করে
বিষমন্ত্র ছুঁড়ে মারে
ওঁ হ্রীং
মায়াপাশে ক্লিষ্ট আমি নষ্ট ভ্রূণ
গর্ভের ভিতরে।
তবুও শয়তান তুই একচুল দূরত্বেই স্থির।

এ শরীর। এই মাংস মেদ মজ্জা
অস্থির গোপনে
বোধ প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত
হিরন্ময় করোটির জটিল গভীরে
আমাকে স্পর্শ তোর কখনো হবেনা।

অরুণ সাধুখাঁ

অঘ্রাণ

আকাশে তোমার রঙ তোমার দেহের মতো শাদা
অঘ্রাণের হিমে শান্ত হ'য়ে আছে সজিনার পাতা
তার চেয়ে তুমি আরো শান্ত হ'য়ে আছো···

বাতাসের রূপ আজ মুছে গেছে হিমেল বাতাসে
পাখির অস্তিত্ব যেন নেই আজ রাতের পাড়ায়
প্রতিভা হারিয়ে আজ নদী সারা গায়ে বালি মেখে
হারানো স্বপ্নের মতো জেগে আছে বালির তলায়।

নিরানন্দই

সুজিত সরকার

প্রার্থনা

মাঝে মাঝে আমার ভিতর থেকে উঠে আসে
বিশুদ্ধ নির্ভার বাক্য
—এই আমার প্রার্থনা
সুন্দরের প্রতি
যে সুন্দর কখনো সৌন্দর্য হারায় না।

ছোট ঘরে রোজ হাসি ও কান্নার গল্প তৈরী হয়—
আমি মনে মনে তার সঙ্গে জুড়ে দিই
বড়ো আকাশের গল্প,
চাঁদ-সূর্য-নক্ষত্রের গল্প
—দিন যায়।

তারপর একদিন সহসা নিজের সঙ্গে দেখা হ'লে
আমার ভিতর থেকে উঠে আসে বিশুদ্ধ নির্ভার বাক্য
—এই আমার প্রার্থনা
সুন্দরের প্রতি
যে সুন্দর কখনো সৌন্দর্য হারায় না।

সঞ্জয় চক্রবর্তী

রবিবার

মাথা খুব ভারী। কুয়াশা ঢুকেছে কিছু ভোরবেলা আজ।
খোলা ছাতে একপায়ে দাঁড়িয়ে থাকি খাড়া।
ঘোর সকাল। শব্দ করে ফুল ফুটল কোথাও।
কিছু বোঝার আগেই বন্দুকের নল বেয়ে
তাজা ডিমের গন্ধ ঢেকে দিল দুপুর।
আজ মাঠে বড়ো খেলা।
পথে নেমেছে অজস্র মানুষ।
আমি যাবো না। 'যাবো না' বলেই,
সিগ্রেট ধরিয়ে একটু ঝুঁকে দেখলাম :
একটি রবিবার দীর্ঘশ্বাসের ভেতর
ভেসে যাচ্ছে, শান্ত।

অরুণ বসু

বন্যেরা বনে সুন্দর...

এরা কেউ তেমন বাচ্চা নয়। প্রত্যেকেই বড়ো-সড়ো হ'য়ে উঠেছে। এবং সংখ্যায়
দশ-বিশটা, বা আরো কিছু বেশি হ'তে পারে। এদের
মা-বাবারা এখনো জীবিত কিনা, বা এদের সন্তান-সন্ততির জন্মায়
এরা অনুভব করে কিনা কে জানে হৃদের

প্রথম শব্দের গিরিখাত ছুঁয়ে-নামা রাধাচূড়া-কৃষ্ণচূড়া ফুলের শরীর !
যেরকম গভীর অরণ্যে গেলে শীৎকারের ধ্বনি, শিহরণ ভেসে আসে
রবীন্দ্রনাথের গান তার চাইতে তেমন সুন্দর নয় সোনার তরীর
বর্ণালিপ। আমাদের আরো দূরে যেতে হবে। এই চোঁচা-ভাদ্রমাসে, ত্রাসে

খুঁজতে চেয়োনা তুমি, এইসব, এসবের অন্য কোনো মানে
বুনোশূয়োরের গন্ধ আমাকেও মাতাল করে। তাল পড়ে। কাশফুল
ফুটেছে কি, ধ্যানে ?

শ্রমশহরের শাসন, কুকুর ও সুধাময়

১.

ও গতকাল রাত্রেও ডেকে উঠেছিলো। আজ হঠাৎ ক'রে মারা গ্যালো। ভোর-বেলায়। সুধাময়ের কুকুর। কুকুরের যেরকম নাম হয়—সেরকম ছিলো ওর একটা নাম। এখন মনে করতে পারছিনা ঠিক-ঠিক।

সুধাময় জানতো, একদিন ওই কুকুরটা মারা যাবে। সেই যখন শ্মশানের জঙ্গল থেকে ওকে তুলে এনেছিলো, তখন থেকেই। সে যাই হোক—মাঝেমাঝেই বোঝার চেষ্টা করতো সুধাময়, মানুষ কুকুর পোষে, নাকি কুকুরই মানুষ পোষে। এবং এর পেছনে লক্ষ্য করার মতো একটা অদ্ভুত জড়তা ছিলো—কুকুরটা কক্খনো কিন্তু যুবতী মেয়েদের তাড়া করতো না। যেমন মানুষ করে না। যেমন সুধাময় করে না। ওর যতো রাগ ছিলো শিশুদের ঘিরে বৃদ্ধদের প্রতি এক দুর্জ্ঞেয় রিরংসা। এবং, বলতে দ্বিধা নেই, কুকুরের একজন বুদ্ধিদীপ্ত সুধাময় ছিলো, সুধাময়ের ছিলো প্রভুভক্ত একটি পা-চাটা কুকুর। অথবা, এভাবেও বলা যায়, কুকুরের একটি প্রভুভক্ত পা-চাটা সুধাময় ছিলো এবং সুধাময়ের ছিলো একজন বুদ্ধিদীপ্ত কুকুর।

২.

এখন আকাশে পূর্ণ কলায় চাঁদ ঝিক্‌মিক্ করছে। সানু পাহাড়ের গা বেয়ে নেমে আসছে পিচ্ছিল মসৃণ সাপের সাথে একদঙ্গল পাহাড়ি বিছে। বনকুকুরের চিৎকার ভেসে আসে বাতাসে। এসময় গা ছম্‌ছম্ ক'রে ওঠে। দূর থেকে মানুষ কিছুই দেখতে পায় না। তবু ভয় এসে জাপটে ধরে শিশুর কোমর। ঘুন্সি খশে পড়ে মাটিতে। মাটির পরতে ক্রমশঃ ছোট হ'য়ে আসে দিন, ক্রমশঃ ছোট হ'য়ে আসে রাত। আর, আকাশে দুধের মতো শাদা জ্যোৎস্না ঝ'রে পড়লে, সুধাময়ের মৃত কুন্তা ওই সমস্ত ঘুন্সিদল মুখে ক'রে স্বর্গের দিকে চৌ-চাঁ দৌড় দ্যায়—দৌড়।

দূরে, বহুদূরে শ্রমশহরের শাসনজনিত ভোঁ বেজে ওঠে—একবার, দুবার, তিনবার।

স্থিরচিত্র রেখাঙ্কনে

নক্ষত্রে আত্মস্থ ক'রে খাগের কলম
রচিছে ললনা প্রেম দয়িতের প্রতি
যেমন সমুদ্রে মিশে নদীর সঙ্গম
অবাক বিস্ময়ে দ্যাখে দৃশ্যের সম্মতি
দূরে শান্ত চেয়ে আছে দিব্যধ্বনি, সুর
শূন্য থেকে নেমে এসে যেমন মাটিতে
বাতাবরণের ঢেউ খেলে যায়, দূর-
সিন্ধুর আদল, বিন্দু, পাথরবাটিতে

এ-সবই কথার কঙ্কা, সারাক্ষণ তবু
স্থিরচিত্র রেখাঙ্কনে, দেহপদ্মফুলে
স্বর্গের রমনী জঙ্ঘা জড়ায় আঙুলে
বুকে অপরূপ তার একজোড়া কবু-
তরের শান্তি ও শিল্প, খাগের কলমে
যদি-না প্রকৃতি মেশে সাগরসঙ্গমে···

বিমূর্ত

স্থিরবিন্দুর মতো বিশাল এক রমণীর সমাহিত মূর্তির পাশে আঁকা একটি সোনালি সাপ, তার চেরা-জিভ লক্‌লক্ করছে, একজন তরুণ বিপ্লবী দূর থেকে দেখছেন, কিছুটা সন্ত্রস্ত এবং বিহ্বল, তার বিহ্বলতার পাশে একজন অন্ধাভিখিরি একটি বাচ্চামেয়ের কাঁধ বাঁ-হাত দিয়ে ধ'রে আছে, ডানহাতে লাঠি, গান গাওয়ার নিথর ভঙ্গিতে তার শরীর ও বলিরেখা ক্রমশঃ টানটান এবং স্পষ্ট।

একটা কিম্ভূত কেভ-এর পাশে বিশাল টানা টিলা' বা ছোট্ট পাহাড়, পাহাড়ে জ্যান্তঈগল, ঈগলের দুইপায়ে বেড়ি, শৃংখল ছাড়া আমাদের আর কিছুই হারাবার নেই, জয় করবার আছে গোটা বিশ্ব···।

মহাকাল অসীম, অনন্ত। এবং নিশ্চিদ্র, নিরাকার।
তবুও এখানে স্মরণ করা যেতে পারে শান্তিনিকেতন এবং সেই পুরুষশিল্পী যাঁর নাম রামকিংকর, যিনি স্বয়ং একই সঙ্গে একটি প্রতিষ্ঠান অথবা পাথর।
(এখানে 'পাথর' শব্দটি যদিও রক্তাক্ত, তবু এর অন্তর্গত অর্থ লক্ষ্য করার মতো গভীর, কিন্তু পারস্পর্যহীন ; তাৎক্ষণিকও।)

আসলে প্রায় গোটা ব্যাপারটাই আমি গুলিয়ে ফেলছি ; আর এইভাবেই মানুষ মানুষের কাছ থেকে দূরে স'রে যাচ্ছে, বহুদূরে ; একাগ্রচিত্ত সন্ন্যাসীর রূপের মতন যা স্তূপাকার ও মহানস্পর্শের অতীত ভাষাবিজ্ঞানের মতো ভয়ঙ্কর এবং উজ্জ্বল।

দক্ষিণে গভীর খাদ সাপের শরীরের মতো সুদূর ও ঠাণ্ডা অরণ্যানি, অবিস্মরণীয়···

আর কিছুই মনে পড়েনা আমার।

অজ্ঞাতবাস আপনার নিজের কাগজ।
তাকে যথাযথভাবে ব্যবহার করার দায়িত্ব কিন্তু আপনার।
নিজের সম্পর্কে যথেষ্ট অহংকার
ও আত্মবিশ্বাস না-থাকলে
অজ্ঞাতবাস-এ
লেখা পাঠাবেন না।

পুনর্মুদ্রণ

দ্বিতীয় ভাগ সহজ পাঠ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
প: ব: সরকার কর্তৃক প্রকাশিত সংস্করণ হইতে

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ষষ্ঠ পাঠ

উষ্ট্রি নদীর ঝরনা দেখতে যাব। দিনটা বড়ো বিশ্রী। শুনছ বজ্রের শব্দ? শ্রাবণ মাসের বাদ্‌লা। উষ্ট্রিতে বান নেমেছে। জলের স্রোত বড়ো দুরন্ত। অবিশ্রান্ত ছুটে চলেছে। অনন্ত, এসো এক সঙ্গে যাত্রা করা যাক। আমাদের দু-দিন মাত্র ছুটি। কলেজের ছাত্রেরা গেছে ত্রিবেণী। কেউ-বা গেছে আত্রাই। সাঁত্রাগাছির কান্তি মিত্র যাবে আমাদের সঙ্গে উষ্ট্রির ঝরনায়। শান্তা কি যেতে পারবে? সে হয়তো শ্রান্ত হয়ে পড়বে। পথে যদি জল নামে মিশ্রদের বাড়ি আশ্রয় নেব। সঙ্গে খাবার আছে, পান্তোয়া আছে, বোঁদে আছে। আমাদের কান্ত চাকর শীঘ্র খেয়ে নিক। তার খাবার আগ্রহ দেখি নে। সে ভোরের বেলায় পান্তা ভাত খেয়ে বেরিয়েছে। তার বোন ক্ষান্তমণি তাকে খাইয়ে দিলে।

অজ্ঞাতবাস

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য লটারি

শুধু লটারির চেয়েও একটু বেশি

তাতে নতুন পশ্চিম বাংলা গড়ে উঠছে— নতুন রাস্তা, নতুন বিদ্যালয়, নতুন হাসপাতাল, তৈরি হচ্ছে, নতুন নতুন গ্রামে বিদ্যুৎ পৌঁছাচ্ছে।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য লটারি

শুধু পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়নের জন্যই—

লটারি আনে সৌভাগ্যের সন্ধান—
আপনার ভাগ্য ফেরাতে আজই একটি

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য লটারির টিকিট কিনুন।

(নদীয়া জেলাশাসকের দপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত)